মুরতাদের শাস্তি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

অনুবাদ: এ.বি.এম.এ খালেক মজুমদার

মুরতাদের শাস্তি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদঃ এ, বি, এম, এ, খালেক মজুমদার
সম্পাদনায়ঃ হাফেজ মাওলানা আবু আশরাফ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা–চট্টগ্রাম–খুলনা

প্রকাশনায়ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০

আঃ প্রঃ ১৫৬

২য় সংস্করণ

রবিউল আউয়াল	১৪১৬
শ্রাবণ	১৪০২
আগষ্ট	১৯৯৫

বিনিময় ঃ ১২.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার ঢাকা–১

مرتد کی سزا –এর বাংলা অনুবাদ
MORTADER SHASHTY by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Published by Adhunik Prokashani 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25, Shirishdas Lane, Banglabazar,
Dhaka-1100

Price : Taka 12.00 Only.

আমাদের কথা

মুরতাদের শাস্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের ধর্মপ্রচার বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি? এই প্রশ্নটি খুবই জটিল। তারপরও এর জবাব পেতে হবে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলছে। তাই প্রশ্নটিও বেশ জোরদার হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী (র) কুরআন–সুন্নাহর নির্দেশনা এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কার্যবিধির আলোকে বিষয়টির উপর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করেছেন। কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য পুস্তিকাটি খুবই সহায়ক হবে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারায় মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছে।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

প্রসঙ্গ কথা

এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখা হয়েছিলো। তরজমানুল কুরআনের ১৯৪২ সনের অক্টোবর থেকে ১৯৪৩ সনের জুন পর্যন্ত কয়েক সংখ্যায় বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যেহেতু এতে ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং অনেক লোকের মনেই এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে আছে, তাই সময়ের সে প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে প্রবন্ধটি পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হলো।

উল্লেখিত প্রশ্নটি ছিলো- "ইসলাম কি ধর্মত্যাগীর (মুরতাদ) সাজা হিসাবে 'মৃত্যুদন্ড'ই নির্ধারণ করেছে? কোরআনে এর কি কোন প্রমাণ পাওয়া যায়? কোরআনের আলোকে যদি এর সাজা 'মৃত্যুদন্ড' প্রমাণিত না হয়, তাহলে হাদীস ও সুন্নাত থেকে এর কতটুকু প্রমাণ উপস্থিত করা যায়? তাছাড়াও হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুরতাদ হত্যার কি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে? জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে ধর্মত্যাগীদের হত্যা করার বৈধতা কিভাবে প্রমাণ করা যায়?

একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম প্রচারের বিষয়ে কি সে একই অধিকার লাভ করবে, যা মুসলমানদের নিজ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে পাওয়া উচিত?

খিলাফতে রাশেদাসহ পরবর্তী খলীফাদের শাসনামলে কাফের ও আহ্লে কিতাবরা কি তাদের স্ব ধর্ম প্রচারের অধিকার লাভ করেছিলো? কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে তাদের এ কাজ অবৈধ হবার কতটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়?

এ দুটো ব্যাপারেই আমি গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। পক্ষ-বিপক্ষ উভয়দিকেই জোরালো যুক্তি- প্রমাণ রয়েছে।

আমার জানা মতে, কুরআন–হাদীসে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বিশেষ কোন ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়না। তরজমানুল কুরআনে এর জবাব প্রকাশিত হলে আনন্দেরই কথা। কেননা আমি ছাড়া ও এ আলোচনায় আরো অনেকেই অংশ নিতে ও জানতে বিশেষ আগ্রহী। এ প্রশ্নে দুটো বিষয় ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

(১) প্রথম বিষয়টি হলো– মুরতাদের হত্যা ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক হুকুম কি?

(২) দ্বিতীয়টি হলো– আমাদের হাতে যুক্তিগ্রাহ্য এমন কি প্রমাণ রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে আমরা নিজেরা নিশ্চিন্ত হবার আশা করতে পারি, এবং অপরকেও তৃপ্ত করার নিশ্চয়তা দিতে পারি? দুটো প্রশ্নেই এ নিবন্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

মুরতাদের শাস্তি—শরীয়তের দৃষ্টিতে

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের কারো অজানা নেই যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় কুফরী জীবনে ফিরে যায়, ইসলামে এ ধর্মত্যাগী ব্যক্তির সাজা 'মৃত্যুদন্ড'। এ সাজার ব্যাপারে উনবিংশ শতকের শেষদিকের অন্ধ ধারণার ফলে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্দেহ অনুপ্রবেশ করে। নতুবা এর আগে পূর্ণ বারো শ'বছর ব্যাপী বিষয়টি গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সর্বসম্মত ব্যাপার হিসাবেই জারী ছিলো। ইসলামী সাহিত্য ভান্ডারের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী সাক্ষি দেয় যে, ধর্মত্যাগীর হত্যার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কখনো দ্বিমত দেখা দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং তাঁদের পরে প্রত্যেক শতকের শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান রয়েছে। এ সবকে একত্রিত করে দেখে নিলে সহজেই বুঝা যায় যে, নবীর (সাঃ) যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একই হুকুম ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ইসলাম ত্যাগের অপরাধে মুরতাদের সাজা প্রাণদন্ড দেয়া হবে কি না এ জাতীয় কোন সন্দেহ আজ পর্যন্ত কোথাও সৃষ্টি হয়নি।

এমন একটি সুপ্রমাণিত বিষয়ে যারা বর্তমান কালের চোখ ঝলসানো জ্ঞানের আলোকে প্রভাবিত হয়ে মতভেদের ফটক উন্মোচন করেছে তাদের দুঃসাহস সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। তারা মোটেও চিন্তা করেনি যে, ধারাবাহিকভাবে দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার সমূহ যদি একবার সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ব্যাপারটা একটা দু'টো বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কোথায়? এর পরে তো অতীতে বর্ণিত হয়ে আসা প্রমাণিত কোন বিষয়ই আমাদের নিকট নিরাপদ থাকতে পারেনা। সেটা চাই কুরআনই হোক অথবা নামাজ, রোজা। বরং প্রথম থেকেই একথা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও কি কখনো দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন? এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি না করে বরং বিশুদ্ধ দলিলে প্রমাণিত ঘটনাবলীর যথার্থতা ও বৈধতা মেনে নেয়ার পর এ দ্বীনের তারা

কি করবেনা যে দ্বীনে ধর্মত্যাগীর শাস্ত 'মৃত্যুদন্ড', তাহলেই সেটা তাদের জন্য অধিক যুক্তিসঙ্গত পন্থা বলে বিবেচিত হতো। নিজের ধর্মের কোন সার্বজনীন স্বীকৃত ও সমর্থিত ব্যাপারকে নিজের যুক্তি–বুদ্ধির মানদন্ডের বিপরীত পেয়ে যে ব্যক্তি একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ব্যাপারটির বিধান মূলত ধর্মেই নেই, সে তার অবস্থাকে "কাফের যখন হওয়াই গেলনা অগত্যা করা কি, মুসলমানই থাক" প্রবাদের সাথে মিলিয়ে নিতে চায়। আসলে তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামের সঠিক পথ থেকে সরে গেছে, শুধু পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বলেই সে এতে অবস্থান করতে আগ্রহী।

কোরআনের আলোকে ধর্মত্যাগী হত্যার নির্দেশের প্রমাণ

জ্ঞান–গরিমা আহরণের উপায়–উপকরণের স্বল্পতার কারণে যেসব লোকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবত ইসলামে ধর্মত্যাগীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড নয় বরং পরবর্তী যুগের মৌলবী– মোল্লাদের আবিষ্কার ও সংযোজন, যা তারা ইসলামের সাথে জুড়ে দিয়েছে, তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে এখানে আমি সংক্ষিপ্তভাবে তার প্রমাণ পেশ করছি।

সুতরাং আল কোরআনের ভাষায়

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ - (التوبہ-۲)

"পুনরায় যদি তারা কুফরী থেকে ফিরে আসে তওবা করে এবং নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। তাদের জন্য আমি আমার আহকাম স্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছি যারা জ্ঞান সম্পন্ন। কিন্তু যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আর তোমাদের ধর্মের

উপর ভর্ৎসনা করে তাহলে কাফেরদের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো। কেননা তাদের শপথের কোন মূল্য নেই। যদি তারা এভাবে ফিরে আসতো।" (সূরা তওবা, ১১-১২ আয়াত)

উক্ত সূরায় আয়াতটি যে প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে তাহলো-৯ম হিজরী সনে হজ্জের সময় আল্লাহতায়ালা "কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন" ঘোষণার হুকুম দেন। এ ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিলো, যে সব লোক এখনো আল্লাহ ও রাসূলের সাথে লড়াই করছে, এবং যুলুম-নির্যাতন চালিয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আল্লাহর দ্বীনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, তাদেরকে সর্বোচ্চ চার মাস সময় দেয়া। এ সময়ে নিজেদের ব্যাপারে তারা চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পেয়ে যাবে। ইসলাম গ্রহণ করতে হলে করে নেবে। তাদেরকে মাফ করে দেয়া হবে। আর দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইলেও তা করতে পারবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাদের বাধা দেয়া হবে না। এর পরও যারা না ইসলাম গ্রহণ করবে, না দেশ ছেড়ে চলে যাবে, তাদের সাথে বুঝা-পড়া হবে অস্ত্রের ভাষায়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনের ভাই। কিন্তু এরপর যদিও তারা পুনরায় তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহলে কুফরীর লিডারদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এখানে অঙ্গীকার ভঙ্গের অর্থ কোনভাবেই "রাজনৈতিক চুক্তি ভঙ্গ" অর্থবোধক হতে পারেনা। বরং পূর্ব বর্ণনার ভঙ্গী স্পষ্টত ইসলামের স্বীকৃতি হতে ফিরে যাবার অর্থই নির্দিষ্ট করে দেয়। এরপর فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ এর অর্থ, ধর্মত্যাগে উদ্বুদ্ধকারী নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো" এছাড়া দ্বিতীয় কিছু হবার অবকাশ থাকতে পারে না।

হাদীসের আলোকে ধর্মত্যাগীর হত্যার প্রমাণ

কুরআনের হুকুমের পর এখন হাদীসের দিকে আসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন من بدل دينه فاقتلوه

-যে (মুসলিম) ব্যক্তি নিজের দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলে তাকে হত্যা করো।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক, হযরত ওসমান গনী, হযরত আলী, হযরত মোয়াজ বিন জাবাল হযরত আবু মুসা আশয়ারী, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, হযরত খালীদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম সহ ৬ল্লেখযোগ্য-সংখ্যক সাহাবা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা নির্ভরযোগ্য সকল হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।

(২) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا
الله وانى رسول الله الا باحدى ثلث: النفس بالنفس والثيب الزانى، والمفارق
لدينه التارك للجماعة ـ

যে ব্যক্তি মুসলমান হবে এবং সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিন অপরাধ ছাড়া তার রক্ত প্রবাহিত করা (হত্যা করা) হালাল নয়। (এক) কাউকে হত্যা করার অপরাধে প্রতিহত্যার যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। (দুই) বিবাহিত ব্যক্তির জিনায় লিপ্ত হওয়া। (তিন) আপন ধর্ম ত্যাগ করে জামায়াত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। (বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ)
(৩) হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا رجل زنى بعد
احصانه او كفر بعد اسلامه او النفس بالنفس (نسائى)

(তিন কারণ ব্যতীত) কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়-যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও জিনা না করে। অথবা মুসলমান হবার পর পুনরায় কুফরীতে লিপ্ত না হয়। অথবা কাউকে হত্যা না করে। (নাসাঈ)

(৪) হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلث

رجل كفر بعد اسلامه او زنى بعد احصانه او قتل نفسا بغير نفس۔

(نسائى باب ايضاً)

আমি রাসূলুল্লাহকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো হালাল নয়। এক– কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হয়ে গেলে, দুই– বিয়ে করার পর জিনা করলে, তিন– অকারণে অন্যায় হত্যা করলে। (নাসাঈ)

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেনঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلث

رجل زنى بعد احصانه فعليه الرجم او قتل عمدًا فعليه القود وارتد بعد

اسلامه فعليه القتل۔ (نسائى باب الحكم فى المرتد)

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, তিনটি অপরাধ ছাড়া কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়। বিয়ের পর জিনা করলে। এর শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। কেউ ইচ্ছা করে কাউকে হত্যা করলে জীবনের বদলা জীবন নাশ করা। ইসলাম গ্রহণ করার পর ধর্ম ত্যাগ করলে। এর সাজা 'মৃত্যুদন্ড'।

ইতিহাসের সমস্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সূত্রে প্রমাণিত, হযরত ওসমান (রাঃ) নিজ বাস ভবনের ছাদের উপর হাজার হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এ হাদীসটি তখন বর্ণনা করেছিলেন বিদ্রোহীরা যখন তাঁর গৃহ অবরোধ করে রেখে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলো। বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় তাঁর এ দলিল পেশ করার উদ্দেশ্য ছিলো– এ হাদীসের আলোকে তিনটি অপরাধ ব্যতীত চতুর্থ কোন অপরাধের কারণে একজন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয নয়। আর আমি এ তিনটি অপরাধের কোনটিই করিনি। তাই আমাকে হত্যা করে তোমরা

নিজেরাই হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীসটি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল। হাদীসটি সহীহ্ কি সহীহ নয়– এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকাবস্থায় হাজারো কণ্ঠে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যেত যে, আপনার এ বর্ণনা সঠিক নয়। অথবা তা সন্দেহযুক্ত। বিদ্রোহীদের গোটা সমাবেশ থেকে একজন লোকও এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ মাত্র খুঁজে পায়নি।

(৫) হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن ثم ارسل معاذ بن جبل بعد ذالك فلما قدم قال ايها الناس اني رسول رسول الله اليكم فالقى له ابو موسى وسادة ليجلس عليها فاتي رجل كان يهوديا فاسلم ثم كفر فقال معاذ لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلث مرات فلما قتل قعد

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আবু মূসা আশয়ারীকে) ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। এরপর তিনি হযরত মুআয বিন জাবালকে তাঁর সহকারী হিসাবে প্রেরণ করেন। মুআয সেখানে পৌঁছে ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট হতে তোমাদের প্রতি প্রেরীত হয়েছি। আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য বালিশ রেখে দিয়েছিলেন যেন তিনি হেলান দিয়ে বসতে পারেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত, যে প্রথমে ইয়াহুদী ছিলো পরে মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় সে ইয়াহুদী ধর্মে ফিরে যায়। মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা অনুসারে এ লোকটিকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি কিছুতেই বসতে পারি না। হযরত মুআয এ কথা তিন তিনবার বললেন। পরিশেষে তাকে হত্যা করা হলে মুআয রাদিয়াল্লাহ আনহু আসন গ্রহণ করলেন (বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ)।

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশায়ই সংঘটিত হয়েছিলো। এ সময় হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু

আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামের গবর্নর ও মুআয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ডেপুটি গবর্ণর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের এ কাজ সত্যি যদি আল্লাহ ও রাসূলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী না হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তাঁদেরকে অভিযুক্ত করতেন।

(৬) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছেঃ

كان عبد الله بن ابى سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فازله الشيطان فَأُلحق بالكفار فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان ابن عفان فاجاره رسول الله - (ابوداؤد، كتاب

আবদুল্লাহ বিন আবী সারাহ এক সময় রাসূলুল্লাহর সেক্রেটারী ছিলেন পরে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে দিলে সে আবার কাফেরদের সাথে মিলে গেলো। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ জারি করলেন। কিন্তু হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পরে তার জীবনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্রয় দিলেন। (আবূ দাউদ)

শেষোক্ত ঘটনাটির ব্যাখ্যা হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনায় আমরা এভাবে দেখতে পাই। তিনি বলেনঃ

لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله ابن سعد بن ابى سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى اوقفه على النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع راسه فنظر اليه ثلثاً كل ذالك يابى فبايعه بعد ثلث ثم اقبل على اصحابه فقال اما فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رانى كففت يدى عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندرى يا رسول الله ما فى نفسك الا اومأت الينا بعينك قال انه لا ينبغى لنبى ان تكون له خائنة الاعين - (ابوداؤد، ايضاً)

মক্কা বিজয়ের পর আবদুল্লাহ বিন সাআদ বিন আবী সারাহ ওসমান বিন আফফানের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছিল। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু

তাকে সাথে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আবদুল্লাহর বাইআত গ্রহণ করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠিয়ে তার দিকে তাকালেন ও নীরব থাকলেন। তিনবার এরূপ হলো। তিনবারই তিনি তার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেন। তিনবারের পর অবশেষে তিনি তার বাইআত গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি সাহাবীগণের দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন– তোমাদের মধ্যে এমন উত্তম ব্যক্তি কি কেউ ছিল না যে, আমি বাইআত গ্রহণ করছিনা দেখে এগিয়ে এসে তাকে হত্যা করে ফেলতো? লোকেরা আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা আপনার অভিপ্রায় বুঝতে পারিনি। আপনি আমাদের প্রতি একটু চোখে ইশারা করলেন না কেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন– চোখে ইশারা করার মত হীন কাজ নবী রাসূলদের মানায় না। (আবূ দাউদ)

(৭) হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন

ان امرأة ارتدت يوم احد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تستتاب فان تابت والا

قتلت (بيهقى)

উহুদ যুদ্ধের সময় (মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে) একজন মহিলা ধর্মত্যাগ করলো। এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– একে তওবা করানো হোক। এ কাজই উত্তম যদি সে এতে রাজি হয়, কথা। অন্যথায় একে হত্যা করা হোক। (বাইহাকী)

(৮) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ

ان امرأة ام رومان ارتدت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يعرض عليها الاسلام

فان تابت والا قتلت (دارقطنى، بيهقى)

উম্মে রোমান (বা উম্মে মারওয়ান) নামক এক মহিলা মুরতাদ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেনঃ তার সামনে ইসলাম

পেশ করা হোক। যদি সে তওবা করে তো উত্তম। অন্যথায় তাকে কতল করে দেয়া হোক। (দারকুতনী,বায়হাকী)

এ প্রসঙ্গে বায়হাকীর অপর এক বর্ণনায় আছে, মহিলাটি ইসলাম কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তাকে হত্যা করা ফেলা হয়।

খিলাফাতে রাশেদার দৃষ্টান্ত ঃ

এ পর্যায়ে খিলাফাতে রাশেদার শাসনামলের দৃষ্টান্তসমূহ লক্ষণীয়। (১) হযরত আবূবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে উম্মে কিরফা নাম্নী জনৈকা মহিলা ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হয়ে যায়। হযরত আবূবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তওবা করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে তওবা করতে অস্বীকৃতি জানায়, আবূবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ অপরাধে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন (দারকুতনী, বায়হাকী)।

(২) মিসরের শাসনকর্তা আমর বিন আস (রাঃ) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি এই মর্মে পত্র লিখেন– এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হয়ে যায়। তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় কাফের হয়ে যায়। এ রকম আচরণ সে কয়েকবার করেছে। এখন তার এ জাতীয় 'ইসলাম কবুল' গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে কিনা? জবাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তার ইসলাম কবুল করেন, তোমরাও কবুল করে যাও। তার সামনে ইসলাম পেশ করো। গ্রহণ করলে ছেড়ে দাও। আর না করলে হত্যা করে ফেলো। (কোনযুল উম্মাল)

(৩) তুসতুর বিজয়ের পর হযরত সাআদ বিন আবূ ওয়াক্কাস ও আবূ মূসা আশয়ারী (রাঃ) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট একজন দূত পাঠালেন। দূত তাঁর সামনে অবস্থার সবিস্তার বর্ণনা পেশ করেন। অবশেষে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, আর কোন বিশেষ কথা আছে কি? দূত বললেন, জী– হাঁ, হে আমীরুল মুমেনীন! আমরা একজন গ্রাম্য আরবকে গ্রেফতার করেছি। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কুফরীতে ফিরে গিয়েছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু

আনহু বললেন, এরপর তোমরা তার সাথে কি আচরণ করলে? দূত বললো, আমরা তাকে হত্যা করে ফেলেছি। এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা এমন না করে বরং তাকে একটি কামরায় আটকিয়ে রেখে দরজায় খিল বন্ধ করে রাখতে। এরপর তিন দিন পর্যন্ত খাবারের জন্য তাকে দৈনিক একটি করে রুটি পাঠাতে। সম্ভবত এ সময় সে তওবা করে নিতো। হে আল্লাহ! একাজ আমার হুকুমে হয়নি। না আমার সামনে হয়েছে। আর না এ খবর শুনে আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ব্যাপারে সাআদ ও আবূ মুসা আশয়ারীর নিকট কৈফিয়ত তলব করেননি। অথবা কোন শাস্তি বিধানও করেননি। (তাহাবী,মুয়াত্তা, বায়হাকী, কিতাবুল উম্ম)

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, হযরত সায়াদ ও আবূ মূসার (রাঃ) এ কার্যক্রম আইনসম্মত ছিলো। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে হত্যার পূর্বে তাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া উত্তম ছিলো।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন, বনি হানিফার একটি মসজিদে কিছু লোক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল (নাউযুবিল্লাহ)। এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ পুলিশ পাঠিয়ে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন। এখানে এসে তারা তওবা করে নিলো। তারা ভবিষ্যতে কখনো এমন কাজ করবে না বলে অঙ্গীকারও করলো। হযরত আবদুল্লাহ অন্যদেরকে তো ছেড়ে দিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন নাওয়াহাকে 'মৃত্যুদন্ড' দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার, আপনি একই ব্যাপারে দু'রকম রায় দিলেন? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জবাবে বললেন, আবদুল্লাহ বিন নাওয়াহা সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুসাইলামার দূত হয়ে এসেছিলো। আমি সেই সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর দরবারে হাজীর ছিলাম। হিজর বিন ওয়াচ্ছাল নামক অপর এক ব্যক্তিও তার সাথে ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন 'তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল'? প্রতি উত্তরে তারা উভয়ে বললো– 'আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল'? একথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বললেন, দূত হত্যা করা বৈধ থাকলে আমি তোমাদের উভয়কে হত্যা করে ফেলতাম। এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, সে কারণেই আমি আজ ইবনে নাওয়াহাকে 'মৃত্যুদন্ড' দিলাম।[১]

বলা বাহুল্য, এ ঘটনা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাত কালের। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তখন তাঁর অধীনে কুফার প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

(৫) একবার কুফায় এমন কিছু লোককে গ্রেফতার করে আনা হল যারা মুসাইলামার দাওয়াত প্রচার করছিলো। এ ব্যাপারে হযরত ওসমানকে (রাঃ) লিখে জানানো হলে জবাবে তিনি লিখলেন, তাদের সামনে আবার দ্বীনে হক এবং শাহাদাতে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পেশ করো। যারা সে দাওয়াত কবুল করবে ও মুসাইলামার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেবে তাদেরকে ছেড়ে দাও। কিন্তু যারা মুসাইলামার দ্বীনে কায়েম থাকবে তাদেরকে কতল করে দেবে।(তাহাবী)

(৬) এক ব্যক্তিকে হযরত আলীর (রাঃ) সামনে পেশ করা হলো, যে প্রথমে ঈসায়ী ছিলো। পরে মুসলমান হয়ে পুনরায় ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আণহু তাকে এ আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকটি জবাবে বললো, 'আমি ঈসায়ী ধর্মকে তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম পেয়েছি।' হযরত আলী জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে তোমার আকীদা কি?' উত্তরে লোকটি বললো, 'তিনি আমাদের রব।' অথবা বলেছে, 'তিনি আলীর রব।' এরপর হযরত আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। (তাহাবী)

টীকা (১) জানা দরকার, ইবনে নাওয়াহা ও হিজর বিন ওয়াছছাল সহ বনি হানিফা গোত্র প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। মুসাইলামার নবূয়ত দাবী করার পর তারা তার নবূয়তের সমর্থক হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দূতদেরকে হত্যা করা যদি জায়েয হতো, তাহলে তোমাদেরকে আমি হত্যার নির্দেশ দিতাম। এ কথার অর্থই হলো যে, ধর্মত্যাগের কারণে তাদেরে হত্যা করা ওয়াজিব। কিন্তু এখন দূত হয়ে আসার কারণে তাদের উপর শরীয়তের সে হুকুম জারি করার আপাত সুযোগ নেই।

(৭) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন, কোনও এক সম্প্রদায় ঈসায়ী ধর্ম হতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আবার ঈসায়ী ধর্ম অবলম্বন করেছে। তিনি তাদেরকে গ্রেফতার করে দরবারে উপস্থিত করার হুকুম দিলেন। উপস্থিত করা হলে তিনি এরূপ করার কারণ জানতে চাইলেন। তারা বললো, আমরা ঈসায়ী ছিলাম। তারপর আমরা ঈসায়ী থাকবো না মুসলমান হবো তা আমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হলো। সে হিসাবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। কিন্তু এখন আমাদের মত হলো যে, আমাদের আগের দ্বীন হতে উত্তম আর কোন দ্বীন নেই। তাই আমরা আবার ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছি। এর পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হুকুমে তাদের হত্যা করে তাদের সন্তান–পরিজনদের গোলাম বানিয়ে নেয়া হয়। (তাহাবী)

(৮) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একবার এ মর্মে খবর দেয়া হলো, কিছু লোক আপনাকে তাদের রব মনে করে। তিনি তাদের উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি বলছো? প্রতি উত্তরে তারা বললো, 'আপনি আমাদের রব, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা।' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমাদের এ অবস্থার জন্য আমার দুঃখ হয়। আমি তো তোমাদেরই মত আল্লাহর এক বান্দাহ। তোমাদের মতই আমি খাই, পান করি। আমি যদি আল্লাহর হুকুম পালন করে চলি তাহলে পুরস্কার পাবো। আর তাঁর নাফরমানী করলে আমার শাস্তি পাবার ভয় আছে। অতএব তোমরা এ আকিদা পরিহার করে আল্লাহকে ভয় করো।' কিন্তু তারা তাঁর পরামর্শ মানতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয় দিন তাঁর গোলাম কুমবুর আরজ করলো, তারা আগের মতেই অটল, কোন পরিবর্তন নেই। তিনি তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলে তারা সে একই কথার আবৃত্তি করলো। তৃতীয় দিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমরা যদি এখনো সে একই কথায় অটল থাকতে চাও, তাহলে তোমাদেরকে শোচনীয়ভাবে কতল করা হবে।' কিন্তু এর পরও তারা তাদের কথায় অটল থাকে। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বেলে তাদের দেখিয়ে বললেন, 'এখনো সময় আছে, তোমাদের বিশ্বাস পরিবর্তন করো।' আর তা না হলে তোমাদেরকে এ গর্তে নিক্ষেপ করা

হবে। কিন্তু এতেও তারা স্বমতে অটল থাকে। অবশেষে হযরত আলীর (রাঃ) হুকুমে তাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো। (ফাতহুল বারী,১২শ খন্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা)

(৯) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'রাহবা' নামক স্থানে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিলো, এখানে একটি পরিবার মূর্তি রেখে এর পুজা করছে। ঘটনা শুনে তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন এবং খোঁজ করে মুর্তির সন্ধান পান। তাঁর হুকুমে ঘরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ফলে বাশিন্দা সহ ঘরটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

(১০) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গিয়েছে এমন একজন লোককে গ্রেফতার করে আনা হলো। তাকে একমাস পর্যন্ত তওবা করার অবকাশ দেয়ার পর জিজ্ঞেস করা হলে সে তওবা করতে অস্বীকার করলো। অতঃপর তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেনঐ (কানযুল ওম্মাল, ১ম খন্ড, ৮ পৃঃ)।

উপরোক্ত দশটি উদাহরণ খোলাফায়ে রাশেদার গোটা শাসনামলের। এ থেকে স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, তাঁদের প্রত্যেকের আমলে যখনি ইসলাম ত্যাগের সমস্যা দেখা দিয়েছে, সাজা হিসাবে সবাই তাঁরা প্রাণদন্ডের বিধানই জারি করেছেন। এছাড়া অন্য কোন অপরাধের কারণে কাউকে'মৃত্যুদন্ডের' শাস্তি দেয়া হয়েছে এ জাতীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে প্রথম খলীফার যুদ্ধ

মুরতাদের বিরুদ্ধে হযরত আবূবকরের (রাঃ) জিহাদ ঘোষণাই হল তাদের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রমাণসিদ্ধ ফয়সালা যা উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ জিহাদে সাহাবায়ে কিরামের গোটা জামায়াতই শরীক ছিলেন। প্রথমত কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে মত দিয়ে থাকলেও পরে তাঁদের সকলেই যুদ্ধের পক্ষে একমত হয়ে যান। কাজেই এ ঘটনাটি এ বিষয়ের স্পষ্ট দলিল যে, গোটা জীবনব্যাপী যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে

সরাসরি তালিম–তারবিয়ত হাসিল করেছেন ইসলাম গ্রহণ করে যারা ছেড়ে দেবে তাদের সাজা মৃত্যুদন্ডের ব্যাপারে তাঁদের সকলেই একমত।

অবশ্য কেউ কেউ এ যুদ্ধের ব্যাখ্যা এভাবে পেশ করেছেন যে, মুরতাদরা প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত কেননা তারা হকুমাতের ট্যাক্স অর্থাৎ যাকাত দেয়া বন্ধ করে নিজেদের পৃথক রাষ্ট্র কায়েমে তৎপর ছিল। কিন্তু চারটি কারণে এ ব্যাখ্যার ভ্রান্তি প্রমাণিতঃ

(১) যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিলো তাদের সকলে যাকাত অস্বীকারকারী ছিলো না। বরং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মুরতাদ শামিল ছিলো। কিছু লোক সে সকল ভন্ড নবীদের উপর ঈমান এনেছিলো যারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নবুয়ত দাবী করেছিলো। কিছু সংখ্যক তো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর থেকে ঈমান প্রত্যাহার করেছিলো। তারা বলতো

لوكان محمد نبيًّا ما مات

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নবী হতেন, তবে মৃত্যুবরণ করতেন না। কিছু লোক দ্বীনের সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী ছিলো এবং যাকাত দিতেও প্রস্তুত ছিলো, কিন্তু তারা বলতো যাকাত আমরা নিজেরাই উসুল করবো এবং আমাদের মধ্যে নিজেরাই বন্টন করবো। আবূবকরের (রাঃ) সরকারী কর্মচারীদের হাতে তুলে দিতে রাজি নই। অপর একদল লোকের বক্তব্য ছিল

اطعنا رسول الله اذ كان بيننا فوا عجبا ما بال ملك ابى بكر

"আমরা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করেছি, তিনি যখন আমাদের মাঝে ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, আবূবকরের হকুমাত কেন আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো?"

সম্ভবত এখানেই তাদের আপত্তি ছিল যে, নবুয়ত পরবর্তী যুগেও খেলাফাতের ধারা চালু থাকার এবং এর প্রতি বাধ্যতামূলক আনুগত্যের দাবী এবং রাসূলুল্লাহর ব্যক্তিত্বের ন্যায় মুসলমানদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক ব্যক্তিসত্তায় জমা করার যৌক্তিকতা কোথায়। অর্থাৎ তাদের মতে এখন আর কেন্দ্রীয় শক্তির অধীন থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সবাই স্বাধীন হওয়া উচিত।

(২) এসব বিভিন্ন রকম লোকের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম বিদ্রোহী শব্দের পরিবর্তে 'মুরতাদ' এবং বিদ্রোহের পরিবর্তে 'ইরতেদাদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তাদের দৃষ্টিতে যে অপরাধ এরা করেছিলো তা ছিলো প্রকৃতপক্ষে 'ইরতেদাদ' বিদ্রোহ নয়। দক্ষিণ আরবে যারা লকীত বিন মালীক আল–আবদীর নবূয়তের স্বীকৃতি দিয়েছিলো তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবূবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইকরামা বিন আবূ জাহলকে জিহাদে পাঠাবার সময় উপদেশ দিয়েছিলেনঃ

ومن لقيته من المرتدة بين عمان الى حضرموت واليمن فنكل به

অর্থাৎ ওম্মান থেকে হাদরামাউত ও ইয়ামান পর্যন্ত যত মুরতাদ পাবে, দলিত মথিত করে ফেলবে।

(৩) যাকাত দিতে যারা অস্বীকার করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েয কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ–সংশয় দেখা দিলে হযরত আবূবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন

والله لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة

"আল্লাহর কসম! যারা নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করবে তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম খলীফার দৃষ্টিতে ট্যাক্স না দেয়া মূল অপরাধ ছিলো না বরং দু'টি আরকানের একটিকে মানা ও অপরটিকে না মানাই ছিলো তাদের আসল অপরাধ। নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কারণে এসব লোক ইসলামের সীমারেখা হতে বের হয়ে গিয়েছে, সত্যনিষ্ঠ খলীফার এ দলিলের উপর মনে পূর্ণ আস্থা আসার পরই সাহাবায়ে কিরাম তাঁর যুক্তিতে সম্মত হয়ে অবশেষে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে খলীফার সাথে একমত হয়ে গিয়েছিলেন।

(৪) এরচেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো হযরত আবূবকরের (রাঃ) আম ঘোষণা (Proclamation) ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য বিভিন্ন

জায়গায় সেনাবাহিনী পাঠাবার সময় প্রত্যেক বাহিনীর কমান্ডারদারকে তিনি যে ঘোষণা লিখে দিয়েছিলেন হাফেজ ইবনে কাছীর তাঁর কিতাব বেদায়া ওয়ান নেহায়ার ৬ষ্ঠ খন্ডের ৩১৬ পৃষ্ঠায় গোটা ঘোষণাটিকে উদ্ধৃত করেছেন। এরমধ্যে নিম্নলিখিত অংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ "তোমাদের যে ব্যক্তি শয়তানের আনুগত্য গ্রহণ করেছে আর যে আল্লাহ হতে নির্ভয় হয়ে ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে ফিরে গেছে তাদের এ অপকর্মের খবর আমি পেয়েছি। এখন আমি অমুক ব্যক্তিকে মুহাজির ও আনসারদের এক দল সৎকর্মশীল বাহিনীর সাথে তোমাদের কাছে পাঠালাম। তাকে নির্দেশ দিয়েছি, কারো কাছ থেকে ঈমান ছাড়া অন্য কিছু যেন গ্রহণ করা না হয়। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আহ্বান করা ব্যতীত যেন কাউকে হত্যা করা না হয়। যে ব্যক্তি তার এ আহ্বানে সাড়া দেবে এবং নিজের আমল ঠিক রাখবে তার স্বীকার উক্তিকে তিনি মেনে নেবেন। তাকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবেন। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে পুনরায় আল্লাহর পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করবেন। কমান্ডারকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অস্বীকারকারীদের যাকে হাতের মুঠোয় পাবে তাকে জীবন্ত ছেড়ে দেবে না। তাদের গ্রামগুলোকে জ্বালিয়ে দেবে। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাদের নারী ও শিশুদেরকে গোলামে পরিণত করবে। ঈমান ছাড়া কারো কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। যারা এ কথা মেনে নেবে তারা নিজেদেরই কল্যাণ সাধন করলো। আর যারা অস্বীকার করলো তারা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আমি আমার প্রেরীত আমীরকে আমার এ ঘোষণা তোমাদের প্রত্যেক সমাবেশে জারি করে দেবার জন্যও নির্দেশ দিয়েছি। ইসলাম গ্রহণ করার প্রতীক হবে আযান। যেখানে আযানের আওয়াজ শুনা যাবে সে এলাকায় কোন সংঘর্ষ করা যাবে না। আর যেখান থেকে আযানের ধ্বনি উচ্চারিত হবে না সেখানকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তারা কেন আযান দিচ্ছে না। যদি তারা আযান অস্বীকার করে তাহলে তাদের উপর প্রচন্ড আক্রমণ হানো। আর যদি স্বীকার করে নেয় তাহলে তাদের সাথে যথাযোগ্য আচরণ করবে।

আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের ঐক্যমত

হিজরী প্রথম শতক থেকে শুরু করে চৌদ্দশ' শতকের ফিকাহ্‌বিদ্‌দের ভাষণ-বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে নকল করলে বিষয়টি বেশ দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। কিন্তু এতটুকু না বললে নয় যে, ব্যাপারটির শাখা-প্রশাখায় যতই মতভেদ থাকুক কিন্তু 'মুরতাদ'-এর সাজা 'মৃত্যুদন্ড' এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌র চার মাযহাবই একমত। ইমাম মালিক প্রণীত গ্রন্থ 'মুয়াত্তায়' তিনি লেখেনঃ

"যায়েদ বিন আসলাম সূত্রে মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন পরিবর্তন করবে তার শির উড়িয়ে দাও।" এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মালিক বলেছেন, যতটুকু আমি এর অর্থ বুঝেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে অন্য ধর্মের আনুগত্য করবে কিন্তু তার কুফরী গোপন করে ইসলামী ভাব প্রকাশ করতে থাকবে যেমন নাস্তিকদের ন্যায় অন্যান্য কপট বিশ্বাসীরা করে থাকে, তাহলে তাদের এ অপরাধ প্রমাণিত হবার পর তাকে হত্যা করা হবে। তাকে তওবা করার আহ্বান করা যাবে না। কারণ এ জাতীয় লোকের তওবায় নির্ভর করা যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যভাবে অন্য কোন দ্বীনের আনুগত্য শুরু করে তাকে তওবার আহ্বান জানাতে হবে। তওবা করে তো উত্তম, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে (বাবুল কাযা ফি মান ইরতাদ্দা আনিল ইসলাম)।

হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আল মুগনীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অভিমতে প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানী নারী-পুরুষের কেউ ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীতে ফিরে গেলে তাকে তিন দিন পর্যন্ত তওবার সুযোগ দিতে হবে। তওবা না করলে হত্যা করে ফেলতে হবে। হাসান বসরী, জুহরী, ইবরাহীম নাখঈ, মাকহূল, হাম্মাদ, মালিক, লাইস, আওযাঈ, শাফেঈ এবং ইসহাক বিন রাহ্‌ওয়াই এ মত পোষণ করেন (১০ম খন্ড, ৭৪ পৃঃ)।

হানাফী মাযহাব

ইমাম তাহাবী তাঁর কিতাব শরহ মাআনিল আমারে হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবেঃ

ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া মুরতাদ–এর নিকট তওবা আহ্বান জানানো হবে কি হবে না শুধু এ ব্যাপারে ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদ। এক অংশ বলেন, মুরতাদের নিকট আমীরের তওবা আহ্বান করাটাই উত্তম। তওবা করলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। অন্যথায় হত্যা করা হবে। ইমাম আবূ হানিফা, আবূ ইউসুফ, মোহাম্মাদ (রহঃ) এ রায় গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অপর এক দল বলেন, তওবা আহ্বান করার কোন দরকার নেই। তাঁদের মতে, মুরতাদরা হলো সেই হরবী কাফেরের ন্যায় যাদের নিকট আমাদের দাওয়াত পৌছেছে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে এদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেবার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য যাদের নিকট দাওয়াত পৌছেনি আক্রমণের পূর্বে দাওয়াত পেশ করতে হবে যেন দলিল পূর্ণ হয়ে যায়। এভাবে যারা অজ্ঞতার কারণে ইসলাম ত্যাগ করে সর্বপ্রথম বুঝিয়ে শুনিয়ে ইসলামের দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বুঝে–শুনে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় তাকে তওবার সুযোগ দেয়া ছাড়াই হত্যা করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফের এক মত এ মতের অনুরূপ। তিনি কিতাবুল এমলায় বলেছেন, তওবার আহ্বান না জানিয়েই মুরতাদকে আমি হত্যা করবো যদি নিজ থেকেই তড়িঘড়ি সে তওবা করে নেয়, তাহলে হত্যা না করে ছেড়ে দেব এবং তার ব্যাপারটা আল্লাহর ফয়সালায় সোপর্দ করে দেবো (কিতাবুল সিয়ার বহছে ইসতিতাবাতুল মুরতাদ)।"

হেদায়ায় হানাফি মাযহাবের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা

"কোন ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করলে (আল্লাহ মাফ করুন) তার সামনে ইসলাম পেশ করতে হবে। যদি তার মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহলে তা নিরসন করবার চেষ্টা চালাতে হবে। সে কোন সন্দেহে পতিত হতে পারে। তার সন্দেহ দূর করে দিলে সে ভয়াবহ একটা পরিণতির (হত্যা) হাত থেকে রক্ষা

পেয়ে কল্যাণকর রূপ (দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে জীবনের নিরাপত্তা অর্জন করা) ধারণ করবে। কিন্তু মাশায়েখে ফুকাহার কথা অনুযায়ী তাদের সামনে ইসলাম পেশ করা ওয়াজিব নয়। কেননা সে আগেই ইসলামের দাওয়াত পেয়েছে। (বাবে আহকামিল মুরতাদ্দীন)।"

দুঃখের বিষয় শাফেঈ ফিকাহর কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব এ সময় আমার হাতে নেই। কিন্তু হেদায়ায় তাঁদের যে মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ ইমাম শাফেঈ (রঃ) হতে বর্ণিত, মুরতাদকে তিন দিনের সময়–সুযোগ দেয়া আমীরের কর্তব্য। সময় দেয়া ছাড়া তাদেরকে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা মুসলমানের ইসলাম বর্জন বাহ্য দৃষ্টির কোন কারণের প্রেক্ষিতে হওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব এ ব্যাপারে চিন্তা–ভাবনা করার সুযোগ পাবার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন আছে। আর এ সময়ের জন্য তিন দিনই যথেষ্ট (বাবু আহকামিল মুরতাদ্দীন)।

এসব দলিলের পর কারো পক্ষেই সম্ভবত এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামে মুরতাদের সাজা হলো মৃত্যুদন্ড। আর এ শাস্তি শুধু ধর্মত্যাগের কারণে। এরসাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অপরাধের কারণে নয়।

হাদীস আর ফিকাহ্র বক্তব্য শুনে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, আল–কোরআনে এ সাজার উল্লেখ কোথায়? এসব প্রশ্নকর্তার পরিতৃপ্তির জন্য আমি এ বইয়ের প্রথমদিকেই কোরআনের হুকুম বর্ণনা করেছি। যদি ধরে নেয়াও হয় যে, কুরআনে এ হুকুম নেই তাহলেও হাদীসের এত অধিক সংখ্যক বর্ণনা, খোলাফায়ে রাশেদীনের সিদ্ধান্তসমূহের নজির এবং ফকীহদের সর্বসম্মত অভিমত এ হুকুম প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু উপরোক্ত দলিলাদি যথেষ্ট মনে না করে যারা কুরআনের দলিল তালাশে আগ্রহী তাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন হলো আপনাদের মতে ইসলামের শাস্তির বিধানসমূহ কি তা–ই যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে? যদি তাদের জবাব ইতিবাচক হয়, তাহলে এর অর্থ দাড়ায়, আপনাদের দৃষ্টিতে কুরআনে যে কাজকে অপরাধ নির্দিষ্ট করে 'সাজা'র যোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, এগুলো ছাড়া কোন কাজই ইসলামী হুকুমাতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে না। যদি তা–ই হয়, তাহলে চিন্তা করে দেখুন, এ মূলনীতির

উপর নির্ভর করে দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র স্বার্থকভাবে একদিনের জন্যও আপনারা চালাতে সক্ষম হবেন কি? এর জবাব যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে তারা নিজেরাই মেনে নিচ্ছে যে, কোরআনে বর্ণিত অপরাধ ও সাজা ছাড়াও ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় অন্যান্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে যারজন্য বিস্তারিতভাবে 'শাস্তির' আইন-কানুন থাকা প্রয়োজন। তাহলে এমতাবস্থায় আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালেও খোলাফায়ে রাশেদীনের হুকুমাতে যে আইন-কানুন জারি ছিলো এবং যা তের'শ বছর পর্যন্ত ধারাবহিকভাবে গোটা উম্মতের জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং আইন বিশেষজ্ঞ আলিমগণ সর্বসম্মতভাবে মেনে চলেছেন সেসব আইন ইসলামী আইন হিসাবে অভিহিত হবার অধিক যোগ্য, না সে সমস্ত আইন প্রবক্তা কতিপয় এমন লোক যারা ইসলামের বিপরীত জ্ঞান এবং অনৈসলামী তামাদ্দুন দ্বারা প্রভাবিত তদুপরি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামান্যতম শিক্ষাও যাদের ভাগ্যে জোটে নাই।

দারুল ইসলামে কুফরীর প্রচার

এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা প্রথম প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত ছিল। অর্থাৎ ইসলামে মুরতাদের 'সাজা' মৃত্যুদন্ড নাকি অন্য কিছু? এখন আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই। সুতরাং প্রশ্নকর্তার ভাষায়ঃ

একটি সত্যিকারের ইসলামী রাষ্টে মুসলমানদের ইসলাম প্রচারের ন্যায় অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব ধর্মমত প্রচারের অবাধ সুবিধা লাভ করা সঙ্গত বিবেচিত হবে কি? খোলাফায়ে রাশেদাসহ পরবর্তী খলীফাদের সময় কাফের ও আহলি কিতাবরা তাদের ধর্ম প্রচারের অধিকার ভোগ করেছিলো কি?

মুরতাদ হত্যার আইনই এ সমস্যাটার সমাধান বহুলাংশে করে দিয়েছে। কেননা আমরা যখন আমাদের আওতায় ও রাষ্ট্রের সীমারেখায় ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া মুসলমানকে অন্য ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণ করার অধিকার দিতে প্রস্তুত নই এমতাবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখায় ইসলাম বিরোধী অন্য কোন দ্বীনের দাওয়াত ও প্রসারকে স্বীকার করি না। অন্য ধর্ম প্রচারের অধিকার দেয়া ও মুসলমানকে ধর্মান্তরিত হবার অপরাধে অপরাধী করা পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী দুই জিনিস। অধিকন্তু শেষোক্ত আইন বলে প্রথমোক্ত বিষয়টি আপনা আপনি বাতিল হয়ে যায়। অতএব মুরতাদ হত্যার আইন বলবতের স্বাভাবিক পরিণামেই ইসলাম তার রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় কুফরীর প্রচার–প্রসারের বৈধতা স্বীকার করে না।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, এ আইন শুধু মুসলমানদেরকে কুফরীর তাবলীগের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম আপন রাষ্ট্রীয় সীমায় বসবাসকারী অমুসলিম এবং বহিরাগত প্রচারকদের তাদের নিজ নিজ ধর্ম ও মতবাদ প্রচারের অনুমতি দেয় কি না?

সমস্যা পর্যালোচনা

এ প্রশ্ন পর্যালোচনা করার জন্য ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইসলামী হুকুমাতের ধরন সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা অপরিহার্য। ইসলাম মূলত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে মানব জাতির সামনে পথ নির্দেশ উপস্থিত করে এবং পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে দাবী করে যে, এর নির্দেশিত পথই নিখুঁত, আর সব পথই ভ্রান্তিপূর্ণ। এতেই মানব জাতির কল্যাণ নিহিত, অন্য সব মত ও পথে তার ধ্বংস আর বিপর্যয় ছাড়া কিছুই নেই। অতএব এ পথেই সব মানুষকে আসা ও অন্যান্য সব পথ পরিহার করা উচিত। যথা– আল–কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

(انعام-١٩)

"আর আমার এ পথই হলো একমাত্র সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথের অনুসরণ করো। অন্য পথে যেও না। অন্যথায় আল্লাহার পথ থেকে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে" (সূরা আনআম, ১৫৩ আয়াত)।

ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তা ও কর্মের যে পথ ও মতের প্রতি একজন অমুসলিম আহ্বান জানায় তা ভ্রান্ত ও ক্রটিপূর্ণ। যার অনুসরণের পরিণতি মানব জাতির ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

যথা

اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ (البقرہ-٢٨)

"মানুষকে তো তারা জাহান্নামের প্রাত আহ্বান করে। অথচ আল্লাহ স্বীয় হুকুম ও বিধান মারফত (তাদেরকে) জান্নাত ও মাগফিরাতের প্রতি আহ্বান জানান" (সূরা বাকারা, ২২১ আয়াত)

এ দাবী ও দাওয়াতের অন্তরালে ইসলাম তার নিজের মধ্যে কোন গোপনীয়তা বা সন্দেহ–সংশয় অবশিষ্ট রাখেনি। তদুপরি সে এ সন্দেহেও লিপ্ত

নয় যে, মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর অন্য কোন পথ ও মত থাকতে পারে। সে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বিশ্বাস করে যে, তার পথই নির্ভুল ও খাঁটি। আর অন্যান্য সকল মত-পথ, আইন-বিধান ভ্রান্ত ও বাতিল। ইসলাম পূর্ণ আস্থা, সরলতা ও স্থিরতার সাথে অনুধাবন করে যে অন্যসব পথ ও মত মানুষকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। তার নিজের দেখানো পথই কেবল মানব জাতির একমাত্র মুক্তির দিশারী।

ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গী যখন এ-ই, তখন মানব জাতিকে চিরন্তন ধ্বংসের দিকে আহ্বানকারী মত ও পথের প্রসার হোক এ কথা তার পক্ষে স্বীকার করা তো দূরের কথা সহ্য করাও কঠিন। আগুনের যে গহীন গহ্বরের দিকে তারা নিজেরা ধাবিত হচ্ছে সেদিকে অন্যদেরকেও টেনে নিয়ে যাবার খোলা লাইসেন্স অন্তত ইসলাম দিতে পারে না। ইসলাম বড় জোর এটা সমর্থন করতে পারে যে, স্বেচ্ছায় যারা কুফরী ব্যবস্থার উপর কায়েম থাকতে ও চলতে চায় আর মুক্তি ও কল্যাণের পথ পরিহার করে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হতে আগ্রহী সে পথে তারা এগিয়ে যাক, তাদের সে অধিকার ঘৃণার সাথে সমর্থন যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। ইসলাম এ অধিকার শুধু এ জন্যই সহ্য করে যে, জোর-জবরদস্তি কারো অন্তরে ঈমান ঢেলে দেয়া প্রকৃতির আইন অনুযায়ী সম্ভব নয়। নতুবা মানবতার সার্বজনীন কল্যাণ ও শুভেচ্ছার দাবী তো এই ছিলো, যদি কুফরীর বিষ পান থেকে মানুষদের জোর করে বাঁচানো সম্ভব হতো তাহলে, যারা এ বিষের পেয়ালা পান করছে, তাদের হাত ধরে বিরত রাখা। ইসলাম জোর-জবরদস্তি করে কাউকে হিফাজত ও নাজাতের দিকে টেনে আনে না। এর কারণ এটা নয় যে, ইসলাম ধ্বংসের গর্তের দিকে ধাবিত হওয়াকে মানুষের অধিকার মনে করে এবং তাকে ধ্বংসের হাত থেকে ফিরিয়ে রাখা ও হিফাজত করাকে বাতিল ধারণা করে বরং এ কল্যাণকর কাজ থেকে ইসলামের বিরত থাকার কারণ এছাড়া আর কিছু নয় যে,আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম-নীতির উপর বিশ্বের বর্তমান ব্যবস্থা রচনা করেছেন,সে দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ব্যক্তিকে কুফরীর ধ্বংসাত্মক পরিণাম থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সে নিজে কুফরী চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতিকে ভুল স্বীকার করে মুসলমানী জীবন যাপনে এগিয়ে আসে। এজন্য এবং

শুধু এ জন্যই ইসলাম আল্লাহর বান্দারা যদি পতন ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে চায় তাহলে তাদের সে অধিকার স্বীকার করে নেয় মাত্র। কিন্তু যে ধ্বংস ও পতনের দিকে তারা নিজেরা এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে অপরাপর বান্দাকেও উৎসাহিত বা আকর্ষণ করুক ইসলামের নিকট আত্নহননকারীদের এহেন প্রত্যাশা অর্থহীন প্রয়াস। যেখানে তার কিছু করার শক্তি নেই সেখানে তো সে অপারগ। কিন্তু যেখানে তার নিজস্ব শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর বান্দাদের কামীয়াবী ও কল্যাণের সে জিম্মাদার সেখানে চুরি-ডাকাতি, বেশ্যবৃত্তি, আফিমখোরী ও বিষপানের আত্মঘাতী প্রচারের অবাধ লাইসেন্স দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, তাহলে এর চাইতে অধিকতর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ তথা শিরক-কুফরী, নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহী মতবাদ প্রচারের ছাড়পত্র দেয়া ইসলামের পক্ষে কিভাবে সম্ভব?

ইসলামী হুকুমাতের মৌলিক উদ্দেশ্য

শুধু মাত্র দেশ শাসন করার জন্য ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করে না। বরং এর একটা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে যা নিম্নোক্ত আয়াতের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। যথাঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(التوبة-٥)

"তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও দ্বীনে হক সহকারে পাঠিয়েছেন; যাতে এ দ্বীনকে সমগ্র দ্বীনের উপর বিজয়ী করে তোলেন। এ কাজ মুশরিকদের যতই অপছন্দ হোক না কেন? (সূরা তওবা,৩৩ আয়াত)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ - (الانفال-٥)

আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা মিটে না যায়। আর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে না যায়।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا - (البقرة-١٤٣)

আর এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাত (সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী) বানিয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা বিশ্ববাসীর উপর সাক্ষি থাকো এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষি থাকবেন। (সূরা বাকারা, ১৪৩ আয়াত)

এসব আয়াতের আলোকে পয়গাম্বরদের মিশনের মূল দাওয়াত ছিলো,যে হেদায়াত ও দ্বীনে হক তারা আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন তা সেই সমস্ত জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করবেন যা দ্বীনের পর্যায়ে পড়ে। এ দ্বারা এ কথা নিশ্চিতরূপে অনিবার্য হয়ে পড়ে, পয়গাম্বর এ মিশনে যেখানে সফল হবেন সেখানে এ ধরনের কোন দাওয়াতের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না যা আল্লাহর হিদায়াত ও তাঁর দ্বীনের মোকাবিলায় অন্য কোন দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা বিজয়ী করার প্রচেষ্টা চালায়। পয়গাম্বরগণের পরে যেভাবে তাঁর স্থলাভিসিক্তগণ এ দ্বীনের উত্তরাধিকার, যা তারা আল্লাহর নিকট হতে নিয়ে এসেছেন, তদ্রুপ সে মিশনেরও তারা উত্তরাধিকারী, যারজন্য আল্লাহ তাঁকে হুকুম দিয়েছেন। তাঁদের সকল চেষ্টা–সাধনার উদ্দেশ্য একটাই যে, দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়েযাবে।

অতএব যেখানে জীবনের সকল বিষয়ের ক্ষমতা তাদের হাতে এসে যাবে এবং যে দেশের বা ভূখন্ডের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তাদের পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর সামনে জিম্মাদারীর সাথে সাক্ষ্য দিতে হবে; সেখানে কোন অবস্থাতেই এটা সম্ভব হতে পারেনা যে, আল্লাহর দ্বীনের মোকাবিলায় অন্য কোন দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের অবাধ সুযোগ তারা সমর্থন বা অনুমতি দিয়ে যাবেন। এ জন্য যে, এ ধরনের সুযোগ দেয়ার অর্থ অবশ্যই এই দাঁড়ায়, দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য নিদিষ্ট হতে না পারে। আর ভ্রান্তিপূর্ণ কোন জীবন ব্যবস্থার ফিতনা যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা যেন আরো জোরদার হতে থাকে। অবশেষে তারা আল্লাহর দরবারে কি সাক্ষি দেবে? তারা কি এ সাক্ষি দেবে যে, যেখানে তুমি আমাকে

তোমার দেয়া জীবন বিধানসম্মত শাসন ব্যবস্থা কায়েমের ক্ষমতা দান করেছিলে, সেখানে আমি তোমার দ্বীনের মোকাবিলায় অপর এক ফিতনা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়ে এসেছি।

দারুল ইসলামে যিম্মী ও আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে তাদের নিজের ধর্মের উপর কায়েম থাকার যে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের জীবন, ধন-সম্পদ ও ধর্মীয় জীবন যাপন রক্ষার যে দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, তার সীমা ও সুযোগ শুধু এতটুকু যে, যেভাবে তারা চাইবে নিজে চলতে পারবে। এ সীমা অতিক্রম করে যদি সে তার নিজের দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টায় লেগে যায়, তাহলে ইসলামী নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য কোন হুকুমাত তাদের এ কাজের অনুমতি দিতে পারে না। কুরআন মজীদের যে আয়াতে জিযিয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে তার মর্ম হলোঃ

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ

"এমন কি তারা তাদের হাত দিয়ে জিযিয়া প্রদান করবে এবং অধীন ও ছোট হয়ে থাকবে।"

এ আয়াতের আলোকে ইসলামী হুকুমাতে যিম্মীদের প্রকৃত অবস্থান হলো যে, তারা অধীন হয়ে থাকতে সম্মত হবে। যিম্মী থাকাবস্থায় তারা বড় ও ক্ষমতাবান হবার চেষ্টা করতে পারে না। একইভাবে বহিরাগত অমুসলিম, যারা আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য কারিগরি শিক্ষা, রাজনীতি, বিদ্যা অর্জন ও অন্যান্য তামাদ্দুনিক উদ্দেশ্যে তো অবশ্যই আসতে পারে। কিন্তু কালিমাতুল্লাহর মোকাবিলায়, অন্য কোন দ্বীন-ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের অনুপ্রবেশ আদৌ সহ্য করা যায় না। কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহতাআলা তাঁর প্রেরিত রাসূলগণকে যে সাহায্য করেছেন এবং পরবর্তী মুসলমানদের সাহায্য করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন আর যার ফলে ইতিপূর্বে দারুল ইসলাম কায়েম হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কায়েম হবে; এর উদ্দেশ্য কেবল এই ছিলো, ভবিষ্যতেও তাই হবে যে, কাফিরদের কথা নীচু

হবে (পরাজিত হবে) এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী বেশে অবস্থান করবে। যথা– কুরআনের ভাষায়ঃ

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا-

অতএব মুসলমানরা আল্লাহর এহেন অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভের পরও যদি নিজেদের হুকুমাতের মধ্যে কাফিরদের কালেমাকে অধীন–দুর্বল অবস্থা হতে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ দেয়া, মূলত আল্লাহর ইহ্‌সান ভুলে যাওয়া এবং তাঁর নিয়ামত অস্বীকার করার নামান্তর।

নবুওত ও খিলাফাতে রাশেদা যুগের কর্মনীতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পলিসি তাই ছিল যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আরবে মুসাইলামা, আসওয়াদে আনাসী, তুলাইহা আসদী, সাজাহ্, লকীত বিন মালিক আযদী এবং এছাড়া ইসলামের মোকাবিলায় আরো যারা ভিন্ন কোন দাওয়াত নিয়ে উঠেছে তাদের সকলকেই শক্তিবলে দমন করা হয়েছে। যেসব অমুসলিম জাতি জিযিয়া প্রদানের চুক্তি সাপেক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মী হিসাবে বসবাস করতে রাজি হয়েছিলো, তাদের অধিকাংশের অঙ্গীকারপত্র হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে অবিকল লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেসবে যাবতীয় অধিকার ও সুযোগ–সুবিধার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু দারুল ইসলামের গন্ডির ভিতর তাদের দ্বীন প্রচারের অধিকারের উল্লেখ কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। মুসলমানরা আপন অনুগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য গুণে যে সকল অমুসলিমকে যিম্মী হওয়ার অধিকার দান করেছিলেন ফিকার গ্রন্থরাজিতে সেসবের বর্ণনাও বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথাকথিত সে 'অধিকারের' উল্লেখ কোথাও বর্তমান দেখা যায় না। আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে বহিরাগত অমুসলিমদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আচার–আচরণ যা হওয়া উচিত তাও ফিকাহ্‌বিদগণ বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাথে বর্ণনা করেছেন। এতে ইশারা–ইঙ্গিতে কোথাও এ কথা বর্ণিত পাওয়া যায় না যে, ইসলামী হুকুমাত

তার গন্ডির ভিতর এ জাতীয় কাউকে তাদের খোদাহীন মতবাদ প্রচারের অনুমতি দিয়েছে। পরবর্তী কালের দুনিয়া পূজারী খলীফা ও বাদশাগণ যদি এর বিপরীত কোন কাজ করে থাকেন তাহলে তা এ কথার প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলামী আইন এসবের অনুমতি দেয়। প্রকৃতপক্ষে সেটা বরং এ কথারই প্রমাণ যে, সে সকল রাজা-বাদশারা সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও দায় দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না অথবা ইসলামী আইনকে তারা উপেক্ষা করে যেতেন। সামাজিক প্রথা ও পরম্পরাগত ঐতিহ্যের বর্তমান ধারণাকে যারা সত্যের মানদন্ড হিসাবে ধরে নিয়েছে বাহবা পাওয়ার আশায় তারা গর্বের সাথে রাজা বাদশাদের এ সকল কার্য কলাপ অমুসলিমদের সামনে পেশ করতে পারে যে, আমাদের মুসলিম বাদশারা অমুসলিমদের মন্দির-মঠ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে এত এত সম্পত্তি ওয়াকফ করেছেন। আর অমুক বাদশার আমলে প্রত্যেক ধর্মের লোকদের তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষিত ছিল। স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের ধর্ম প্রচারে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বাদশাহদের এসব কার্যকলাপ তাদের অপরাধের তালিকায় লিখে রাখার যোগ্য।

মুরতাদ হত্যার যুক্তিনির্ভর আলোচনা

এখন আমি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত প্রশ্নের আলোচনার প্রয়াস নিতে চাই। অর্থাৎ ইসলামে যদি প্রকৃতই মুরতাদের সাজা মৃত্যুদন্ড হয় আর সে যদি মূলত নিজের রাষ্ট্রসীমায় কোন বিরোধী দাওয়াত উত্থিত হতে ও তা প্রচার করতে দেয়াকে অবৈধ মনে করে, তাহলে আমাদের হাতে এমন কোন্ দলিল রয়েছে যার ভিত্তিতে একে আমরা সঙ্গত বিবেচনা করতে পারি। এ পর্যায়ে প্রথমত আমি মুরতাদ হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করবো, অতঃপর কুফরী মতবাদ প্রচারের নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক আলোচনায় অগ্রসর হবো।

অভিযোগকারীদের প্রমাণ

মুরতাদ হত্যার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সকল আপত্তি উঠতে পারে তা হলোঃ

(এক)–ধর্মত্যাগীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড আত্মিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। অথচ যে জিনিসের উপর মনের তৃপ্তি আসবে তা গ্রহণ করা আর যে বিষয়ে তৃপ্তি আসবে না তা বর্জন করে চলার স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের থাকা প্রয়োজন। কোন 'মতবাদ' প্রথমদিকে গ্রহণ করার বা না করার ব্যাপারে একজন লোকের যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই, তদ্রুপ তা গ্রহণ করার পর এর উপর কায়েম থাকা বা না থাকার ব্যাপারেও তার সে স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। কোন ধর্মমত গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত সে এ কারণেই তাতে অগ্রসর হবে যে, প্রথমে তার এ মতবাদ সত্য সঠিক মনে হওয়াতে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন সে এ ব্যাপারে সন্দিহান। তাই বিশ্বাস উঠে যাবার পর যখন কোন ব্যক্তি পূব মতবাদ ছেড়ে দেবার ইচ্ছা করে, তখন তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে? বস্তুত এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, কোন ব্যক্তির

মতামতকে দলিল–প্রমাণে ভুল প্রমাণিত করতে অপারগ হয়ে তাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, স্বীয় মত তোমাকে পরিবর্তন করতেই হবে। এতে সে রাজি না হলে এ মত পরিবর্তন না করার অপরাধেই তাকে সাজা দেয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ যে রায় জোর–জবরদস্তি করে বদলানো হয় অথবা মৃত্যুদন্ডের ভয়ে যে রায়ের উপর মানুষ কায়েম থাকে তা তো কোন অবস্থায়ই ঈমান ভিত্তিক রায় হতে পারে না। মূলত এটি হবে জীবন বাঁচানোর জন্য ধোঁকার পথ অবলম্বনের মতো একটি মোনাফেকী আচরণের নামান্তর। অবশেষে এ ধরনের ধোঁকা ও মোনাফেকী দ্বারা একটি ধর্ম কিভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? ধর্ম বা মতবাদ যে ধরনেরই হোক, তার প্রতি অটল আস্থা না থাকা অবস্থায় সে মত অনুসরণের কোন অর্থই হতে পারে না। আর এ কথা স্পষ্ট যে,জোর–জবরদস্তি করে কারো মনে যেমন ঈমান সৃষ্টি করা যায় না, তদ্রুপ তা মনে অবশিষ্ট্যও রাখা যায় না। জোরপূর্বক মানুষের মাথা নত অবশ্যিই করানো যায় বটে; কিন্তু বলপূর্বক মানুষের মন–মগজে ঈমান ও ইতিকাদের বীজ বপন করা যায় না। তাই যে ব্যক্তি মন–মানষিকতায় কাফের হয়ে আছে, মৃত্যুদন্ডের ভয়ে তাকে মোনাফেকী চরিত্র অবলম্বন করে প্রকাশ্যে মুসলমান বানিয়ে রাখার সার্থকতা কোথায়? এমতাবস্থায় সে ইসলামেরও সঠিক অনুসারী হবে না আর আল্লাহর নিকটও তার এ কপট ঈমান নাজাতের উপায়ও হবে না। উপরন্তু তার শামিল থাকাতে মুসলিম সমাজে একজন সৎলোকের বৃদ্ধি হলোনা।

তৃতীয়তঃ যদি এ নীতি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, কোন ধর্ম বা মতবাদ তার অনুগতদের সকলকে এর আনুগত্যে বাধ্য করার অধিকারী এবং তার সীমারেখা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া জায়েয, তাহলে এর দ্বারা সকল ধর্মের প্রচার ও প্রসারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি স্বয়ং ইসলামের পথেও এটা কঠিন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। কেননা ব্যক্তিমাত্রই কোন না কোন ধর্ম বা মতবাদের অনুসারী। প্রতিটি ধর্মই যদি মুরতাদের সাজা মৃত্যুদন্ড করে. তাহলে শুধু মুসলমানদেরই অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা দুরুহ হয়ে পড়বে না; বরং অমুসলিমদের পক্ষেও ইসলাম গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

চতুর্থতঃ এ ব্যাপারে ইসলাম সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নীতি অবলম্বন করেছে। একদিকে ইসলাম বলে; لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ–দ্বীনে কোন জবরদস্তি নেই।

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

–যার খুশী ঈমান গ্রহণ করুক যার খুশী কুফরী অবলম্বন করুক। অপর দিকে ইসলাম নিজেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডের ধমক দিচ্ছে। একদিকে সে মোনাফেকীর নিন্দাবাদ প্রচার করে: নিজ অনুসারীদের অবিচল আস্থাশীল ঈমানদার দেখতে চায়, অপরদিকে সে নিজে ইসলামের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়া মুসলমানকে মৃত্যুদন্ডের ভয় দেখিয়ে মোনাফেকী ঈমান প্রকাশ করতে বাধ্য করছে। ইসলাম একদিকে সে সকল অমুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলছে স্বধর্মীদের যারা ইসলাম গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে, অপরদিকে সে নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছে, তোমাদের মধ্যে যারা ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করবে তাকে হত্যা করে ফেল।

এসব আপত্তি ও অভিযোগ দৃশ্যত খুবই শক্তিশালী বলে মনে হয়। মুসলমানদের এক দলকে তো এসব যুক্তির কাছে হার মেনে পরাজয় বরণকারী লোকদের বস্তাপচা প্রাচীন পলিসির উপর আমল করতে হয়েছে যে, নিজ ধর্মের যেসব সমস্যার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনকারীদের প্রতিবাদ শক্তিশালী মনে হয়। নিজের আইন গ্রন্থ থেকে সেসব বাদ দিয়ে পরিষ্কার বলে দাও, এসব বিষয় আমাদের দ্বীন–ধর্মে মূলত বর্ণিতই নেই। বাকী রইল মুসলমানদের অপরপক্ষ প্রথমোক্তদের ন্যায় যাদের পক্ষে এ সত্য অস্বীকার করা সম্ভব ছিলো না। তারা যদিও প্রকৃত ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করার হক আদায় করেছে কিন্তু এ সমস্ত যুক্তিসঙ্গত আপত্তির বিবেকসম্মত কোন জবাব উপস্থিত করা তাদের সাধ্যে কুলায়নি। ফলে তাদের দুর্বল দলিল–প্রমাণের কারণে মজবুত ঈমানের অধিকারী মুসলমানের অন্তরেও এ কথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ইসলামে ধর্মত্যাগীর শাস্তি 'মৃত্যুদন্ড' রয়েছে বটে, কিন্তু একে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে প্রমাণ করা কঠিন ব্যাপার। আমার বেশ মনে আছে, আজ থেকে আঠার বছর আগে কোন উপলক্ষে হিন্দুস্তানে ধর্মত্যাগীর শাস্তি 'মৃত্যুদন্ডের' ব্যাপার নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। চারদিক থেকে এ ব্যাপারে বাদ প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। এ সময় মওলানা

মোহাম্মদ আলীর ন্যায় নিষ্ঠাবান মুসলমানের ও এ ধরনের দলিল-প্রমাণের কাছে হার না মেনে উপায় রইলো না। আলেমদের মধ্য থেকে অনেকেই শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়েছেন বটে; কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অভিযোগের জবাবে এমন প্রাণহীন ও দুর্বল দলিল পেশ করলেন যাতে সন্দেহ হচ্ছিল আপন মনে তারা নিজেরাই সম্ভবত ব্যাপারটিকে যুক্তির দৃষ্টিতে দুর্বল অনুভব করছেন। এহেন দুর্বল প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া আজও বাকী রয়ে গেছে।

একটি বুনিয়াদী ভুল

প্রণিধানযোগ্য ইসলামের মূল্যবোধ প্রকৃতপক্ষে যদি তাই হয়, যে অর্থে বর্তমানে অন্যান্য ধর্ম প্রচলিত, তাহলে অতৃপ্ত মনে ইসলাম পরিত্যাগকারীর উপর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করণের প্রস্তাব অযৌক্তিক ও বিবেকবর্জিত সাব্যস্ত হওয়া যথার্থ ছিল। কেননা ইসলাম সম্পর্কে বর্তমানে যে ধারণা বিদ্যমান তা হলো, এটা কেবল অপ্রাকৃতিক সমস্যাবলীর এক কল্পনা-বিশ্বাস মাত্র, যা মানুষ অন্ধ ভক্তিতে গ্রহণ করে। তদ্রূপ পারলৌকিক জীবনে নাজাত লাভের একটি উপায় ও পদ্ধতি বিশেষ, যার ভিত্তিতে মনের আকীদা অনুযায়ী মানুষ আমল করে থাকে। কিন্তু সামাজিক সংগঠন, পার্থিব সমস্যাবলীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্র পরিচালনার রূপকাঠামো নির্ধারণ নিছক দুনিয়াবী ও পার্থিব ব্যাপার-স্যাপার, যার সাথে ধর্মের সম্পর্ক বলতে নেই। এ ধারণা অনুযায়ী মাযহাব বা ধর্মের অবস্থান কাল্পনিক রায় তুল্য। সে রায়ও আবার এমন রায় যা জীবনের অবাস্তব অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যার প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া আর প্রভাব মানব জীবনের অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ শাখার উপর পতিত হয় না। বলাবাহুল্য, এ ধরনের রায়ের ব্যাপারে মানুষের স্বাধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত অপ্রাকৃতিক বিষয়াদির ব্যাপারে স্বতন্ত্র মত পোষণে তো ব্যক্তি স্বাধীন থাকবে। অথচ তার দৃষ্টিতে অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে পূবর্তন মত ভ্রান্তিপূর্ণ মনে করার ব্যাপারে সে স্বাধীন মতের অধিকারী স্বীকৃত হবে না, এ কথা সঙ্গত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এভাবে কোন কারণ থাকতে পারে না যে, যখন কোন একটি পদ্ধতি অনুস্মরণে পরকালীন জীবনের নাজাতের প্রত্যাশা করা হয়, তখন তা

অবলম্বন করতে পারবে। আর যখন সে অনুভব করবে যে, নাজাতের আশা এ পথে নেই, অন্য কোন পথে এ আশা বিদ্যমান; তখন আগের পথ ছেড়ে দিয়ে নতুন পথ অবলম্বন করার তাকে অধিকার না দেয়ারও কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। সুতরাং ইসলামের মূল্যবোধ যদি এটাই হতো, যা আজকাল মাযহাবের অবস্থা নির্ণিত হয়ে আছে তাহলে এরচেয়ে অযৌক্তিক কথা আর কিছু হতে পারে না যে, আগমন কারীদের জন্য তো সে ঘরের দরজা খুলে দেবে আর প্রত্যাগমনকারীদের জন্য দরজায় জল্লাদ বসিয়ে রাখবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অবস্থা শুরু থেকেই এমনটি নয়। কারণ, আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী ইসলাম শুধু একটি মাযহাব নয়, বরং পরিপূর্ণ এক জীবন ব্যবস্থা। এর সম্পর্ক শুধু অপ্রাকৃতিক বিষয়ের সাথেই নয়; বরং স্বভাব প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের সাথেও এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ইসলাম শুধু মৃত্যুর পরের জীবনের মুক্তির আলোচনাই করে না, মৃত্যুপূর্ব পার্থিব জীবনের সফলতা, কল্যাণ-কামিতা এবং সঠিক রূপায়ণের ব্যাপারেও আলোচনা করে। একইভাবে পারলৌকিক মুক্তিকে মৃত্যুর আগের জীবনের সফল বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল আখ্যা দেয়। যদি মেনেও নেই যে, তারপরও এটা শুধু একটা ধ্যান-ধারণাই। কিন্তু তা সে ধরনের নিছক কল্পনা নয় যা অবাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। বরং এটা এক বাস্তব চিন্তা যার উপর ভিত্তি করে গোটা জীবনের রূপকাঠামো কায়েম হয়। সে রায় নয় যার প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ স্তরে পড়ে না। বরং ওটা এমন এক সংকল্প যার বাস্তবায়নের উপর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্ভরশীল। এর পরিবর্তনের অর্থ সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এটা সে কল্পনা নয়,যা শুধু যুক্তিগতভাবে একজন মানুষ গ্রহণ করে থাকে। বরং এটা সেই প্রত্যয় যার উপর ভিত্তি করে মানব গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য এক অংশ গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে একটি বিশেষ কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠা করে এবং তা চালানোর লক্ষ্যে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। এমন ধরনের রায় ও মতাদর্শকে ব্যক্তি স্বাধীনতার খেলনা বানানো যায় না। আর যে দল বা জনসমষ্টি উক্ত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে তাহজীব তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা

কায়েম করে তাদেরকে পথচারি মুসাফির বানানো যায় না যে, যখনই মন মগজে বিশেষ কোন ঢেউ ওঠে তখন তাতে ঢুকে পড়ে। যখন দ্বিতীয় ঢেউ ওঠে তার থেকে বেরিয়ে যায়। অতঃপর এমনিতর যখন ইচ্ছা, ভিতরে আসবে আর যখন ইচ্ছা, বেরিয়ে যাবে। এটা কোন খেলা বা প্রমোদ ভ্রমণ নয় যে, দায়িত্বহীনভাবে এতে মন ভোলানো যাবে। এটা মূলত অত্যন্ত মার্জিত বিবেকসম্মত ও অপরিসীম সূক্ষ্মতা মন্ডিত কাজ, যার সামান্যতম চড়াই-উৎরাই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যার গড়া ও ভাঙ্গার সাথে লাখো কোটি আল্লাহর বান্দার জীবনের সুখ-শান্তি ও উত্থান-পতন নির্ভরশীল । যা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী জীবন-মৃত্যুর বাজি লাগায়। এহেন প্রত্যয় এবং এর পোষণকারী জামায়াতের সদস্য হওয়াকে ব্যক্তি স্বাধীনতার খেলনা কে বানিয়েছে, কখন বানানো হয়েছে, যে ইসলাম থেকেও একই আশা পোষণ করা সঙ্গত হতে পারে।

সুসংগঠিত সমাজের জন্মগত চাহিদা

একটি সুসংগঠিত সমাজ, যা রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে, নিজের সীমারেখার কর্মপরিমন্ডলে সে সকল লোকদের কর্মপরিচালনার সুযোগ কমই দিয়ে থাকে, যারা এর মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ পোষণ করে। শাখাগত মতভেদ তো কম-বেশী সহ্য করা যায়, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো যেসব বুনিয়াদের উপর ভিত্তিশীল তার সাথে মতভেদ যারা পোষণ করে তাদেরকে সমাজে স্থান দেয়া এবং রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে মেনে নেয়া দুরূহ ব্যাপার। এ বিষয়ে ইসলাম যতটুকু সহনশীলতা ও শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে অপর কোন জাতি বা রাষ্ট্র এর দৃষ্টান্ত প্রমাণ করতে অপারগ। বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্র তাদের মৌল বিষয়ে মতবিরোধ পোষণকারীকে হয় শক্তিবলে এর অনুগত বানিয়ে নেয় অথবা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এটা ইসলামেরই একক বৈশিষ্ট্য যে, এজাতীয় লোকদের ইসলাম জিম্মি বানিয়ে এবং অধিকতর কর্ম স্বাধীনতা দান করে আপন সীমারেখায় বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের বহুবিধ এমন সমস্ত কার্যকলাপও সহ্য করে যায়, যা সরাসরি ইসলামী

সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক পর্যায়ের। এ সহশীলতার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলাম মানুষের স্বভাব–প্রকৃতি থেকে নিরাশ নয়। ইসলাম আল্লাহর বান্দাদের ব্যপারে শেষ সময় পর্যন্ত এ আশা পোষণ করে যে, যে সত্যের আলো তারা এখনো অবলোকন করতে পারেনি, সে সত্য দ্বীনের অধীনে থেকে এর সুশীতল ছায়া, নেয়ামত ও বরকত অবলোকনের সুযোগ পেলেই অবশেষে এ দ্বীন গ্রহণ করবে। এ কারণেই সে ধৈর্য ও সহ্যের সাথে কাজ করে যায়। যে সকল পাষাণ পরান আপন সমাজ ও রাষ্ট্রে এখনো একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পারেনি, ইসলাম তাদের এই আশায় সহ্য করে নেয় যে, কোনও এক সময় এদের মতান্তর ঘটা বিচিত্র নয়। এখন স্বতস্ফূর্তভাবেই এরা ইসলামী সমাজভুক্ত হয়ে একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু যে শিলাখন্ড একবার বিগলিত হওয়ার পর পুনরায় কঠিন শৈলকণায় পরিণত হয় এবং প্রমাণ করে দেয় যে, এ জীবন ব্যবস্থায় বিলীন হওয়ার প্রয়োজনীয় উপাদান ও যোগ্যতাই সে হারিয়ে ফেলেছে, এমতাবস্থায় এ সমাজ থেকে তাকে দূরে নিক্ষেপ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় থাকে না। তার ব্যক্তিসত্তা দারুণ মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু তাই বলে এত দামী স্বীকার করা যায় না যে, তার কারণে গোটা সমাজের, গোটা রাষ্ট্রের বিপর্যয় সহ্য করা হবে।

অভিযোগের জবাব

মুরতাদের শাস্তি 'মৃত্যুদন্ডকে' যারা এ অর্থ করে যে, এটা শুধু একটি মত গ্রহণ করার পর তা ছেড়ে দেবার সাজা, তারা নিজেরাই প্রকৃত বিষয়টি ভুল পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে। এরপর নিজেই একটা ভুল হুকুম জুড়ে দেয়। যেমন ইতিপূর্বে এর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মুরতাদের আসল অবস্থা হলো ধর্মত্যাগের মাধ্যমে সে প্রমাণ দেয় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদী ব্যবস্থাকে শুধু অগ্রাহ্যই করেনা, বরং ভবিষ্যতেও কখনো গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্র যে বুনিয়াদের ভিত্তিতে গঠিত, এ ব্যক্তি যখন সে ভিত্তি মূলকে গ্রহণযোগ্য মনেই করে না, তখন তার উচিত সে নিজেই এর আওতা হতে বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে যখন সে পথে অগ্রসর হয় না তখন তার জন্য দুই

ব্যবস্থার যে কোন এক পন্থায়ই তার চিকিৎসা হতে পারেঃ (ক) যাবতীয় নাগরিক সুযোগ–সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, হয় তাকে দেশের ভিতর বেঁচে থাকতে দেয়া হবে। অথবা (খ) তার জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেয়া হবে। প্রথম অবস্থা প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় অবস্থা অপেক্ষা কঠিনতর সাজা। কেননা এমতাবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ অর্থাৎ সে মরবেও না বাঁচবেও না। এ অবস্থায় সমাজের জন্যও সে বিপজ্জনক সাব্যস্ত হয়। কেননা তার অস্তিত্ব থেকে সমাজে তখন মানুষের মধ্যে এক স্থায়ী ফিতনা প্রচার হতে থাকবে। এতে সুস্থ সবল দেহেও এ বিষ সংক্রমিত হবার আশংকা থেকে যাবে। এজন্য উত্তম হলো 'মৃত্যুদন্ডের' শাস্তি দ্বারা সমাজ ও তার নিজের বিপদের পুরাপুরি অবসান করা। মুরতাদকে হত্যা করার অর্থ এ রকম করাও ভুল যে, আমরা এক ব্যক্তিকে হত্যার ভয় দেখিয়ে তাকে মোনাফেকী আচরণ করতে বাধ্য করি। আসলে ব্যাপারটা এর বিপরীত।

এ ধরনের লোকদের জন্য আমরা নিজেদের জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হবার পথকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে চাই। কেননা এরা বহুরূপী সাজার রোগে আক্রান্ত আর আদর্শ পরিবর্তন করাকে এরা আনন্দের খেলা মনে করে থাকে। যাদের মতামত ও চরিত্রে সে দৃঢ়তার অস্তিত্বই নেই যা একটি জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠাবার জন্য প্রয়োজন। বলাবাহুল্য একটি জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত নিপুণ ও স্থির চিত্ততার কাজ। যে দল এ কাজ করার জন্য তৈরী হয় তাদের মধ্যে অস্থির চরিত্রের খেলো লোকদের কোন স্থান হতে পারে না। যারা সত্যিকারভাবে মার্জিত চিত্ত ও স্থিরতার সাথে এ জীবন বিধানকে গ্রহণ করে, আর যখন গ্রহণ করে তখন হৃদয়–মন দিয়েই সে বিধান প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠনে লেগে যায়, শুধু তাদেরই এ দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সুতরাং এ দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ব থেকেই জ্ঞাত করানো হিকমাত ও বিজ্ঞের কাজ যে, এ দলে আসার পর ফিরে যাবার শাস্তি 'মৃত্যুদন্ড'। তাহলে অন্তর্ভুক্ত হবার আগেই সে শতবার চিন্তা করে দেখবে–এ দলে প্রবেশ করা উচিত কি উচিত নয়। এমনিতর চিন্তা ভাবনার পর এ দলে সে–ই পা দেবে যাকে আর বের হয়ে যেতে হবেনা।

তৃতীয় পর্যায়ে যে অভিযোগ আমি নকল করেছি তার ভিত্তিও ভ্রান্তিপূর্ণ। অভিযোগকারীদের দৃষ্টিতে প্রকৃত-পক্ষে সেই মাযহাব ও এর প্রচারের ব্যাপারটাই ফুটে উঠেছে যার সংজ্ঞা পূর্বেই আমি দিয়ে এসেছি। এ ধরনের মাযহাবের দরজা আগমনকারী ও নির্গমনকারীদের জন্য সদাসর্বদা খোলাই রাখতে হয়। এ মাযহাব যদি নির্গমনকারীদের জন্য দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে তা হবে অসঙ্গত আচরণ। কিন্তু যে সুচিন্তিত ও কার্যকর মাযহাবের উপর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা হয়, সামষ্টিক জীবনের উপর দুরদর্শিতা সম্পন্ন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের ধ্বংস এবং গঠন কাঠামোর বিভিন্ন অংশের বিছিন্নতা এবং নিজের অস্থিত্ব বন্ধনকে বিপর্যস্ত করার দরজা নিজেই খোলা রাখার পরামর্শ দিতে পারে না।

সুসংগঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা ও বিনষ্ট করা সব সময়ই জীবন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার মত নিবেদিত প্রাণ লোকদের কাজ এবং প্রকৃতি ও পদ্ধতিগত দিক থেকে এ কাজ সব সময়ই এভাবেই চলতে থাকবে। বস্তুত আগুন আর রক্তের হোলি খেলা ছাড়া কোন জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দুনিয়ায় কখনো সম্ভব হয়নি, আর ভবিষ্যতেও কখনো এমন হবার আশা করা যায় না। কোন ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সেই জীবন ব্যবস্থাই পরিবর্তন হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে, যে জীবন ব্যবস্থার শিকড় কাটা পড়েছে এবং যার ভিত্তি মূলে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার আছে বলে বিশ্বাসের তোড় নিভে গেছে।

এখন রইলো একে অপরের বিপরীত হবার অভিযোগ। এ পর্যায়ে উপরের আলোচনা মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে এ অভিযোগ বহুলাংশে নিজে নিজেই দূর হয়ে যায়। لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।" এই কথার অর্থ এই যে, নিজের দ্বীনে আসার জন্য আমরা কাউকে বাধ্য করি না। আর প্রকৃত অবস্থাও তাই। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রবেশ করে ফিরে যেতে চায় তাকে আগেই সাবধান করে দেয়া হয় যে, এ দরজা আগমন ও নির্গমনের জন্য খোলা নেই, থাকেও না। তাই যদি প্রবেশ করতে চাও তাহলে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রবেশ

করো। একবার প্রবেশ করলে আর ফিরে যাবার পথ খোলা পাবে না। যদি ফিরে যেতে হয়, তবে অনুগ্রহ করে প্রবেশই করো না। এখন বলুন, এতে বৈপরীত্যের কি আছে? নি:সন্দেহে আমরা মোনাফেকীর নিন্দা করি। আমাদের এ দলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আমরা সাদেকুল ঈমান তথা নিষ্ঠাবান মুমিন দেখতে চাই। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের বোকামীর জন্য নিজে সে দরজায় পা রাখে যার সম্পর্কে আগ থেকেই সে অবহিত ছিল যে, তা ফিরে যাবার জন্য খোলা নেই, সে যদি মোনাফেকীতে লিপ্ত থাকে তাহলে তা তারই অপরাধ। তাকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার জন্য আমরা আমাদের জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য দরজা খুলে দিতে পারি না। সে যদি এতই সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকে, মোনাফিক হয়ে থাকতে না চায়, বরং যে বিষয়ের উপর এখন ঈমান এনেছে তার প্রতি আনুগত্যের নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে মৃত্যুদন্ডের জন্য নিজেকে পেশ করতে সে কাতর কুন্ঠিত কেন? অবশ্য দৃশ্যত এ আপত্তি কিছুটা গুরুত্বের দাবীদার যে, ইসলাম যখন নিজের অনুসারীদের ধর্ম পরিবর্তনে চরম শাস্তি নির্ধারণ করে এবং এটাকে নিন্দনীয় মনে করে না, তাহলে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের স্বধর্মীদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে শাস্তি দিলে তারা এর নিন্দা ও আপত্তি করার কারণ কি? এ দুটো আচরণে বাহ্যত যে বৈপরীত্য দেখা যায় আসলে সেটা ভিত্তিহীন অমূলক চিন্তা। উভয় ক্ষেত্রে একই আচরণ অবলম্বন করা হলে সেটাই বরং পরস্পর বিপরীত হওয়ার কথা ছিল। ইসলাম নিজকে সত্য বলে এবং আন্তরিকতার সাথেই হক বলে মনে করে। এ কারণে সে হকের প্রতি আগমনকারী এবং হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া প্রত্যাগমণকারীকে একই মর্যাদায় স্থান দিতে রাজি নয়। হকের প্রতি আগমনকারীর এদিকে আসার অধিকার স্বীকৃত। যে এ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সে নিন্দার যোগ্য। কিন্তু এ সত্য দ্বীন থেকে প্রত্যাগমনকারীর এ পথ থেকে ফিরে যাবার অধিকার দেয়া যায় না। যে এ পথে বাধা দেবে সে নিন্দার পাত্র নয়। বস্তুত এর আচরণে বৈপরীত্যের প্রশ্নই আসে না। অবশ্য ইসলাম যদি নিজকে সত্য ও বলে দাবী করে তার সাথে সাথে নিজের প্রতি আগমনকারী এবং এর থেকে প্রত্যাগমনকারীকে একই মর্যাদায় অভিহিত করতো তাহলে এটা নিঃসন্দেহে একটি বিপরীতধর্মী চরিত্র ছিল।

শুধু ধর্ম এবং ধর্মীয় রাষ্ট্রের মৌল পার্থক্য

মুরতাদের শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ডের' ব্যাপারে আপত্তিকারীদের যেসব দলিল–প্রমাণ আমি উপরে বর্ণনা করেছি এবং তাদের জবাবে আমার তরফ থেকে যেসব দলিল প্রমাণ পেশ করেছি সে সবের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলো মুরতাদের সাজা সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যত আপত্তি উত্থাপন করেছে তা কেবল একটি 'ধর্মের' দৃষ্টিভঙ্গীতেই করেছে। পক্ষান্তরে আমরা এ শাস্তিকে অত্যন্ত সঠিক বলে দাবী করার জন্য যে সব দলিল–প্রমাণ পেশ করেছি, আমাদের সে দাবী নিছক ধর্ম হিসাবে নয়। বরং এমন একটি রাষ্ট্র হিসাবে, যে রাষ্ট্র কোন বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী বা জাতির শাসনের পরিবর্তে একটি দ্বীন ও এর নীতিমালার শাসনকে ভিত্তি করে গঠিত হয়।

নিছক একটি ধর্মের প্রশ্নে আমাদের ও আপত্তি উত্থাপনকারীদে মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মত পার্থক্য নেই যে, এ জাতীয় ধর্ম মুরতাদকে মৃত্যু [illegible] সাজা দিবার অধিকারী হতে পারে না। কারণ সমাজের আইন--শৃংখলা এবং [illegible]র অস্তিত্ব ও গঠন কাঠামো কার্যত এ ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আপত্তি উত্থাপনকারীদের ধারণা অনুযায়ী যেখানে এবং যে অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এমন এক ধর্মীয় মূল্যবোধের ধারক সেখানে আমরা নিজেরাও মুরতাদের শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড' দেবার পক্ষপাতী নই। ইসলামী ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে কেবল মুরতাদের সাজাই নয় বরং এর তামীরী হুকুমের (শাসনমূলক বিধান) একটিও ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ যোগ্য সাব্যস্ত হতে কোন নির্দেশই ইসলামী রাষ্ট্র পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী হুকুমাত (শরীয়তের পরিভাষায় 'সুলতান') প্রতিষ্ঠিত না থাকে। অতএব সমস্যার এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এবং আপত্তি উত্থাপনকারীদের মধ্যকার বিতর্কের অবসান নিজে নিজে ঘটে যায়।

এখন সমস্যার অপর দিকটা আলোচনা যোগ্য থেকে যায়। অর্থাৎ ধর্ম যেখানে নিজেই শাসক ধর্মীয় আইনই রাষ্ট্রীয় আইন, ধর্মই যেখানে নিরাপত্তা ও শৃংখলা বহাল রাখার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়, ধর্ম সেখানেও কি তার

আনুগত্যের অঙ্গীকার করার পর তা থেকে বের হয়ে যাওয়া লোকদের সাজা দেবার অধিকার রাখে না? আমরা তো এর ইতিবাচক জবাব দিয়ে থাকি। আমাদের আপত্তিকারী বন্ধুরা কি এর নেতিবাচক জবাব দিতে চান? যদি না চান তাহলে তো মতভেদই থাকে না। আর যদি চান তাহলে জানতে চাই এতে তাদের আপত্তি কোথায় আর তাদের দলিলই বা কি?

রাষ্ট্রের আইনগত অধিকার

স্বকীয়ভাবে ধর্মীয় রাষ্ট্র সঠিক কি না সেটা এক ভিন্ন আলোচনা। কেননা রোমক পাদ্রীদের দুঃখজনক ঘটনার বেদনাদায়ক ইতিহাস পাশ্চাত্যবাসীদেরকে আজও ধর্মীয় রাষ্ট্রের নামে আতংকিত করে তোলে। এ কারণে, ধর্মীয় রাষ্ট্রের ধারণা সৃষ্টি হতে পারে (যদিও এ ধারণা পাদ্রীতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন) কখনো এ জাতীয় কথাবার্তার সুযোগ ঘটলে আবেগ-উচ্ছ্বাসের আতিসর্যে ঠান্ডা মাথায় তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত কথা বলার যোগ্যই থাকতে দেয় না। অনুরূপ তাদের প্রাচ্যদেশীয় শিষ্যরা সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন সমস্যা সম্পর্কিত জ্ঞানের যত দীর্ঘ বহর প্রসার করুক তার সবটুকুই পাশ্চাত্য থেকে ধার করে আনা। তারা তাদের গুরুদের কাছ থেকে শুধু জ্ঞান-বুদ্ধির উত্তরাধীকারই অর্জন করেনি বরং এর সাথে তাদের আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁক-প্রবণতা ও জাতীয়তাবোধের প্রচন্ড আকর্ষণও উত্তরাধীকার সূত্রে বহন করে। তাই ধর্মত্যাগের শাস্তিসহ এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা উঠলেই পশ্চাত্যবাসী হোক কি তাদের প্রাচ্যবাসী শিষ্য উভয় পক্ষই ভারসাম্যহীন হয়ে সাংবিধানিক ও আইনগত প্রশ্ন ধর্মীয় রাষ্ট্রের সাথে জড়িয়ে ফেলে। প্রকৃতিগতভাবে ধর্মীয় রাষ্ট্র বৈধ কি অবৈধ সে বিষয়ে বিতর্ক শুরু করে দেয়, যা তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল না। যদি মনে করা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র মূলত সে অর্থেই একটি 'ধর্মীয় রাষ্ট্র' যে অর্থে পাশ্চাত্যবাসীরা গ্রহণ করে; তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। এ পর্যায়ে প্রশ্ন শুধু এই যে, রাষ্ট্র কোন ভূখন্ড শাসন করার অধিকারী, সে এ ধরনের কার্যকলাপ অপরাধ সাব্যস্ত করার অধিকার সংরক্ষণ করে কিনা? যা তার অস্তিত্ব বিনাশ করে দিতে উদ্ধত। এ সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকলে তিনি

আমাদের দেখিয়ে দিন, বিশ্বের কোণ্ রাষ্ট্র, কোন্ দেশ সে অধিকার প্রয়োগ করে। কিংবা এমন অধিকারকে ব্যবহার করছে না। সমাজতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র সমূহ ছেড়ে দিন। এসব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকেই দেখুন যাদের ইতিহাস ও আদর্শ থেকে বর্তমান বিশ্ব গণতন্ত্রের সবক গ্রহণ করেছে আর যারা আজ গণতন্ত্রের পতাকা বহনের মর্যাদায় আসীন তারা কি এ অধিকারের যথাযথ ব্যবহার করে যাচ্ছে না?

ইংলেন্ডের দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংল্যান্ডকেই ধরুন। বৃটিশ আইন যাদের সম্পর্কে আলোচনা করে তারা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম প্রকার বৃটিশ প্রজা সাধারণ (british subjects)। দ্বিতীয় শ্রেণী হলো বিদেশী (aliens) বৃটিশ প্রজা সাধারণ বলতে সাধারণত ওদেরই বুঝায়, যারা বৃটিশ রাষ্ট্রের সীমায় অথবা এর বাইরে এমন পিতার ঔরষজাত সন্তান, যারা বৃটিশ সম্রাটের আনুগত্য করতে বাধ্য। এদেরকেই জন্মগত বৃটিশ নাগরিক হিসাবে অভিহিত করা হয়। এদেরকে আপনা থেকেই সম্রাটের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে বাধ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। এদের জন্য পৃথকভাবে বৃটিশ রাজ্যের আনুগত্যের শপথ নেয়া অনিবার্য নয়। দ্বিতীয়ত এ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় যারা পূর্বে বিদেশীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অতঃপর কিছু আইনগত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বৃটিশ রাজের আনুগত্যের শপথ নিয়ে এখানকার নাগরিকত্ব সনদ লাভ করে। অপরদিকে বিদেশী বলে তাদেরকেই বুঝানো হয়, যারা ভিন্ন জাতির সাথে সম্পর্কিত এবং অন্য রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক, কিন্তু বৃটিশ রাজত্বে বাস করে। এ জাতীয় বিভিন্ন রকমের মানুষ সম্পর্কে বৃটিশ আইনের নিম্নলিখিত নীতিমালা লক্ষণীয়ঃ

(১) যে সকল বিদেশী লোক বৃটিশ নাগরিক হওয়ার প্রয়োজনীয় আইনগত শর্ত পূরণ করেছে, ইচ্ছা করলে সে তার সাবেক জাতীয়তা বর্জন করে বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভের দরখাস্ত করতে পারে। এ অবস্থায় স্টেট সেক্রেটারী প্রয়োজনীয় সকল বিষয় অনুসন্ধান করে দেখার পর বৃটিশ সম্রাটের আনুগত্যের শপথ নিয়ে তাকে বৃটিশ জাতীয়তা সার্টিফিকেট প্রদান করবে।

(২) কোন ব্যক্তি, চাই জন্মসূত্রে বৃটিশ নাগরিক হোক, চাই স্বেচ্ছায় বৃটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকুক, তথাকার আইনের দৃষ্টিতে বৃটিশ রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে থাকা অবস্থায় অন্য কোন রাষ্ট্রের জাতীয়তা গ্রহণ করতে পারে না। একইভাবে অন্য রাষ্ট্রের আনুগত্যের শপথ নেয় অথবা প্রথম সে যে জাতীয়তার সাথে সম্পর্কিত ছিলো তাতে পুনরায় ফিরে যাওয়ার অধিকারও পায় না। বৃটিশ শাসনের বাইরে কোথাও বসবাস করে তারাই শুধু এ অধিকার লাভ করতে পারে।

(৩) বৃটিশ শাসনের বাইরে বসবাস করা অবস্থায় ও বৃটিশ নাগরিকদের কেউই (চাই জন্মগত নাগরিক হোক, চাই নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাইরাগত হোক) যুদ্ধাবস্থায় বৃটিশ জাতীয়তা বর্জন করে এমন কোন জাতির বা এমন কোন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে পারেনা যারা বৃটিশ জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। বৃটিশ আইন অনুযায়ী এ কাজ চরম বিশ্বাসঘাতকতা (High reason)।এ অপরাধের সাজা 'মৃত্যুদন্ড'।

(৪) বৃটিশ নাগরিকদের কোন ব্যক্তি দেশে বা দেশের বাইরে অবস্থান করা অবস্থায় যদি সম্রাটের শত্রুদের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা যোগায় অথবা এমন কোন কাজ করে যা শত্রুপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে অথবা সম্রাট বা দেশের আক্রমণ ক্ষমতা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল করে দেয়, তবে এটাও চরম বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এর শাস্তিও 'মৃত্যুদন্ড'।

(৫) রাজা, রাণী বা যুবরাজের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া, এর ধারণা পোষণ করা, রাজরাণী, তার বড় কন্যা অথবা যুবরাজের স্ত্রীর অমর্যাদা করা, বাদশাহর দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে ইশারা করা অথবা তাকে নিশানা বানানো অথবা ক্ষতি করা বা ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে তার সামনে অস্ত্র আনা, রাষ্ট্রীয় ধর্ম পরিবর্তন করা অথবা রাষ্ট্রীয় আইনকে রহিত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা– এসবও চরম অপরাধ। এসবের অপরাধী মৃত্যুদন্ড পাবার যোগ্য।

(৬) সম্রাটকে তার পদ, উপাধি বা মর্যাদা হতে বঞ্চিত বা পদচ্যুত করাও অপরাধ। এ কাজের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

এসব ব্যাপারে সম্রাট অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি কার্যত রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত (De- Facto) হবেন, সেটা অধিকারের ভিত্তিতে হোক অথবা না হোক। এ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, এসব আইন-কানুন কোন আবেগ তাড়িত বুনিয়াদের উপর রচিত হয়নি। বরং সুচিন্তিত নীতিমালার আলোকে প্রণীত, যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা অপরিহার্য এবং এর পরিমন্ডলে চলমান সমাজ জীবনের আইন-শৃংখলা এর উপর নির্ভরশীল। নিজস্ব গঠন প্রক্রিয়ার অঙ্গসমূহকে শক্তি প্রয়োগে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং নিজের প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থাকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য শক্তি প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গতভাবেই উক্ত আইন-বিধান ও রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বীকৃত অধিকার রয়েছে।

অতএব লক্ষ্য করুন, বৃটিশ আইন যাদেরকে 'বিদেশী' বলে তাদের প্রকৃত অবস্থান সামান্য পার্থক্যসহ ইসলামী আইনে জিম্মিদের [১] অবস্থানের মতই। তদ্রুপ বৃটিশ নাগরিক বলতে যেমনঃ জন্মগত ও অবলম্বিত নাগরিক বুঝায় একইভাবে ইসলামেও মুসলমান বলতে দু'ধরনের মানুষ বুঝায়। এক প্রকার লোক হলো, যারা মুসলমানদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় প্রকার হলো যারা অমুসলিম থেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে।

বৃটিশ আইন, রাজা ও রাজপরিবারকে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে যে মর্যাদা দেয়; ইসলামী আইন আল্লাহ ও রাসূলকে সে স্থান দেয়। অতঃপর বৃটিশ আইন যেভাবে বৃটিশ নাগরিক ও বিদেশীদের অধিকার ও কর্তব্যে পার্থক্য সূচিত করে, একইভাবে ইসলামও মুসলমান এবং জিম্মিদের অধিকার ও

---

[১] উপরোক্ত আলোচনা বুঝার সুবিধার্থে মনে রাখা দরকার, বৃটিশ আইনে 'বিদেশী' (Alien) অর্থ সেই সকল লোক যারা বৃটিশ রাজত্বের আনুগত্য করতে বাধ্য নয় অথচ বৃটিশের রাষ্ট্রসীমায় এসে বসবাস করে এই শর্তে যে তারা বৈধ উপায়ে দেশে প্রবেশ করবে এবং দেশের আইন-কানুন, নিয়ম-শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী বৃটিশ সাম্রাজ্য সীমায় এ জাতীয় লোকদের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু নাগরিকত্বের অধিকার দেয়া যাবে না।

কর্তব্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। বৃটিশ আইন যেভাবে বৃটিশ প্রজাদের কাউকে আপন সাম্রাজ্য সীমায় বাস করা অবস্থায় অন্য কোন জাতীয়তা গ্রহণ করা, ভিন্ন রাষ্ট্রের আনুগত্যের, শপথ নেয়া অথবা নিজের সাবেক জাতীয়তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অধিকার স্বীকার করে না। ইসলামও তদ্রুপ কোন মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্র সীমায় বাস করা অবস্থায় অন্যকোন ধর্ম অবলম্বন করা অথবা সাবেক ধর্ম পুনর্বার গ্রহণ করার অধিকার দান করে না। বৃটিশ আইন অনুযায়ী কোন নাগরিক মৃত্যুদন্ডের যোগ্য বিবেচিত হবে যদি সে সাম্রাজ্য সীমার বাইরে থেকে বৃটিশ রাজ্যের শত্রুদের জাতীয়তা গ্রহণ করে কিংবা কোন শত্রু রাষ্ট্রের আনুগত্যের শপথ নেয়; একইভাবে ইসলামী আইন মোতাবেকও যে মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে থেকে শত্রুপক্ষের ধর্ম গ্রহণ করে, তার শাস্তি 'মৃত্যুদন্ড'। অধিকন্তু যেভাবে বৃটিশ আইন সে সকল লোককে 'বিদেশীর' অধিকার দিতে রাজি, যারা বৃটিশ জাতীয়তা বর্জন করে কোন চুক্তিবদ্ধ জাতির জাতীয়তা গ্রহণ করে; তদ্রুপ ইসলামী আইনও এমন মুরতাদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ জাতির কাফেরের ন্যায় আচরণ করে, যে দারুল ইসলাম ত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। এখন আমাদের কাছে এটা বোধের অগম্য বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যেসব লোক ইসলামী আইন-কানুনের পজিশন বুঝতে পারে না, বৃটিশ আইনের পজিশন তারা কি করে বুঝতে সক্ষম হয়?

সে অধিকার কেবল তাদেরই দেয়া হবে যারা রাষ্ট্র শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। এছাড়া বিদেশী হিসাবে বৃটিশ সীমায় বসবাস করার অধিকার শুধু সাময়িকভাবে বহিরাগত বসবাসকারীদের দেয়া যেতে পারে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়ী নাগরিক ও জন্মগত নাগরিকদের এ অনুমতি দেয়া যেতে পারে না যে, তারা বিদেশী হয়ে (অর্থাৎ বৃটিশ-রাজ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করে) বৃটেনে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে ইসলামের প্রচলিত আইন, সে সকল লোকদের অমুসলিম হিসাবে গণ্য করে যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করবে না। অতঃপর ইসলাম তাদেরকে অবস্থানগত ও অধিকারের ভিত্তিতে এভাবে বিভক্ত করেঃ

(১) যে অমুসলিম বৈধ পথে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করে দেশের আইন-কানুন ও নিয়ম-শৃংখলার প্রতি মর্যাদাবোধ পোষণ করে তার আশ্রয় প্রার্থী হয় এরা 'মস্তামান'। রাষ্ট্র কর্তৃক এদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে,কিন্তু নাগরিকত্ব দেয়া যাবে না।

(২) যারা ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ী এবং জন্মগত নাগরিক হবে (গোটা বিশ্বের প্রচলিত আইনের বিপরীত) ইসলামী আইন তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম প্রজা হিসাবে বসবাস করার অধিকার দান করে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে তারা বাধ্য নয়; এ ধরনের লোকরা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য ও শুভেচ্ছা কামনার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে ইসলামী আইন এদেরকে "জিম্মী প্রজা" হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের শুধু নিরাপত্তাই প্রদান করে না বরং সীমিত পর্যায়ে নাগরিকত্বের অধিকারও প্রদান করে।

(৩) বাইর থেকে আগত অমুসলিমও যদি জিম্মী হয়ে থাকতে চায়, তাহলে জিম্মী হবার শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে তারাও নাগরিক দলে শামিল হয়ে যেতে পারে। নিরাপত্তা সহকারে উপ-নাগরিকত্বের অধিকার পেতে পারে। কিন্তু জিম্মী হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করা অবস্থায় জিম্মীর দায়িত্ব মুক্ত হবার অধিকার তাদের দেয়া যায় না। দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়াই হলো দায়িত্ব মুক্ত হবার একমাত্র উপায়।

(৪) ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকার মুসলমান তথা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকারীদের জন্যই নির্দিষ্ট। তারা জন্মগত নাগরিক হোক চাই বাইর থেকে হিজরত করে আসা লোক মার্কিন আইন সে পার্থক্যই নির্ণয় করে। বৃটিশ আইন তার নাগরিক ও অনাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকে। একজন বিদেশী লোক নাগরিকত্বের সব শর্ত পালন করার পর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হবার ব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু নাগরিক হয়ে যাবার পর যুক্তরাষ্ট্রের সীমায় বসবাস করে নাগরিকত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজের সাবেক জাতীয়তায় প্রত্যাবর্তন করার স্বাধীনতা তার থাকে না। অনুরূপ জন্মসূত্রে নাগরিকও যুক্তরাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে থেকে অন্য কোন জাতীয়তা গ্রহণ করে অপর রাষ্ট্রের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে না। একইভাবে

নাগরিকদের গাদ্দারী ও বিদ্রোহের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনও সে একই নীতিমালার উপর ভিত্তি করে রচিত যার ভিত্তিতে বৃটিশ আইন প্রণীত হয়।

আমেরিকার দৃষ্টান্ত

গ্রেট বৃটেনের পর বিশ্বে গণতন্ত্রের দ্বিতীয় পতাকাবাহী দেশ আমেরিকাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা যায়। এ দেশের আইন–কানুন যদিও ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের দিক দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেন থেকে ভিন্ন কিন্তু এর পরও মৌলিক দিক থেকে তা এর সাথে পুরাপুরি সামঞ্জসশীল। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে যে স্থান সম্রাটকে দেয়া হয়েছে, আমেরিকায় সে স্থান দেয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় রাষ্ট্রকে ও সমন্বিত সংবিধানকে। একজন মার্কিন নাগরিকের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি সন্তান যুক্তরাষ্ট্রের জন্মসূত্রে নাগরিক, চাই সে যুক্তরাষ্ট্রীয় সীমায় জন্মগ্রহণ করুক অথবা এর বাইরে। আর অর্জিত নাগরিক সেই ব্যক্তি হতে পারে,যে ব্যক্তি কয়েকটি আইনগত শর্তাবলী পূরণ করার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের নীতিমালার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এ দু'শ্রেণীর নাগরিক ছাড়া বাকী সব লোক হলো আমেরিকার আইনের চোখে 'বিদেশী'। নাগরিক ও অনাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে এসব শুধু এ দুটো রাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বিশ্বের যে কোন দেশের আইনের প্রতি লক্ষ্য করা হোক না কেন সেখানেই এ আইন কার্যকর দেখতে পাওয়া যাবে যে, একটি রাষ্ট্র যেসব উপাদান–উপকরণ সমন্বয়ে গঠিত হয় সেগুলোর বিচ্ছিন্নতা ও ভাঙ্গন প্রবণতাকে তারা শক্তি বলে দাবিয়ে দেয়। উপরন্তু প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর সকল বিষয়–ব্যক্তিকে এমনিতর ক্ষমতা বলে নির্মূল করা হয়।

রাষ্ট্রের স্বাভাবিক অধিকার

কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত স্ব–স্থানে বৈধ কি অবৈধ সেটা ভিন্ন কথা। এ ব্যাপারে আমাদের ও পার্থিব রাষ্ট্র– নায়কদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্য কারো XX(৪) হোক। কিন্তু যারা জন্মসূত্রে মুসলিম অথবা মুসলমান হয়ে গেছে, তারা দেশে থাকা অবস্থায় অমুসলিম

হওয়ার অধিকার পেতে পারে না। দেশ থেকে বের হয়ে গিয়ে তারা ইচ্ছা করলে এ আচরণ করতে পারে। কিন্তু দেশে থাকা অবস্থায় এ আচরণ করলে শুধু জিম্মী অথবা মুস্তামান তথা আশ্রয় প্রার্থীর অধিকারই খর্ব হবে না বরং তার এ আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে গণ্য হবে।৪

সার্বভৌমত্বের আদলে রাষ্ট্র নির্মাণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এ কারণে যে রাষ্ট্র স্বয়ং না–জায়েয ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তারজন্য আমরা এ কথা জায়েয বলে স্বীকার করতে পারি না যে, সে নিজের না–জায়েয অস্তিত্ব ও ভুল জীবন ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য শক্তি ব্যবহার করুক। পক্ষান্তরে আমাদের বিরোধীরা খোদায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে না- জায়েয এবং শুধু খোদাহীন রাষ্ট্রকেই জায়েয মনে করে। এ কারণে তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহবিমুখ রাষ্ট্র কর্তৃক নিজের অস্তিত্ব ও প্রশাসন কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা বৈধ ও যথার্থ মনে করে। কিন্তু আল্লাহভিত্তিক রাষ্ট্রের পক্ষে এ একই পদক্ষেপ তাদের দৃষ্টিতে অন্যায় ও বাতিল। যাহোক এ আলোচনা বাদ দিয়ে স্বকীয় পর্যায়ে এ মূলনীতি বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, যে কোন রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা চরিত্রগতভাবেই দাবী করে যে, তার নিজের অস্তিত্ব ও ব্যবস্থাপনা সুসংহত রাখার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এটা রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার। যদি কোন জিনিস এ অধিকার বাতিল করতে পারে তাহলে তা শুধু এই, যে রাষ্ট্র এ অধিকার হতে উপকৃত হতে চায়, সে নিজেই বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেননা বাতিলের জন্ম নীতিগত–ভাবেই একটি অপরাধ। এমতাবস্থায় সে যদি তার প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে তাহলে সেটা হবে মারাত্মক অপরাধ।

কাফের ও মুরতাদ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম কেন?

এ পর্যায়ে একজন সাধারণ লোকের চিন্তায় এ প্রশ্ন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে থাকে যে, জন্মসূত্রে কাফের হওয়া আর মুসলমান হয়ে পুনরায় কাফের হয়ে যাওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কি? এক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন, যে আইন একজন লোকের প্রথম কাফের হওয়াকে স্বীকার করে নেয় এবং আপন সীমারেখায়

বসবাস করার নিরাপদ আশ্রয় দান করে সে আইনই অবশেষে উক্ত লোকের ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় কাফের হয়ে যাওয়াকে অথবা জন্মগতভাবে কোন মুসলমান কাফের হয়ে যাওয়াকে সহ্য করতে না পারার কারণ কি? প্রথমপ্রকার কাফেরের কুফরী ও দ্বিতীয় প্রকার কাফেরের কুফরীর মধ্যে নীতিগত প্রভেদ কি? যে আইনের দৃষ্টিতে প্রথমোক্ত জন অপরাধী নয় অথচ দ্বিতীয় জন অপরাধমুক্ত। প্রথম জনকে জিম্মী বানিয়ে তার জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে অথচ দ্বিতীয় জনকে জীবনের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শূলে চড়িয়ে দেয়?

এর জবাব হলোঃ যারা ইসলামের সাথে এসে এখনো যোগ দেয়নি তারা, আর যারা যোগ দিয়ে বের হয়ে গেছে এরা-এ দুয়ের মধ্যে মানব-প্রকৃতি অবশ্যই পার্থক্য নিরূপণ করে। মিলিত না হওয়াটা তিক্ততা,ঘৃণা ও শত্রুতা উৎপাদন করেনা, কিন্তু একবার যোগ দিয়ে বের হয়ে যাওয়া শতকরা প্রায় একশ' ভাগ সে অবস্থার সৃষ্টি করে। যারা প্রথম থেকেই যোগ দেয়নি তাদের দ্বারা কখনো এসব ফিতনা সৃষ্টি হয় না, একবার মিলিত হয়ে বের হয়ে যাওয়া লোক দ্বারা যে ক্ষতি হয়। যারা মিলেনি তাদের সাথে আপনি সহযোগিতা, বন্ধুত্ব, লেনদেন, বিয়ে-শাদী, গোপন কথা বলাসহ অসংখ্য তামাদ্দুনিক ও ব্যবহারিক সম্পর্ক অবশ্যই স্থাপন করেন না। অথচ একাত্মতার ভরসায় যে একবার মিলিত হয়েছে তার সাথে আপনি এ সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন। এ কারণেই যারা মিলিত হয়নি তাদের দ্বারা এতটা ক্ষতি সাধিত হতে পারেনা যতটা ক্ষতি একবার মিলিত হবার পর বের হয়ে গেলে সাধিত হয়। এজন্যই যারা মিলেনি তাদের তুলনায় মানুষ সেই সকল লোকদের সাথে স্বভাবতই সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম আচরণ করে যারা একবার মিলিত হয়ে পৃথক হয়ে যায়। ব্যক্তি জীবনে মিলিত হবার পর দূরে সরে যাবার পরিণাম ফল সাধারণত একটু মন কষাকষি হওয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সামষ্টিক জীবনে এ আচরণ মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক ব্যবহারও তিক্ত-কঠোর হয়ে থাকে। যেখানে পৃথক হয়ে যাবার লোক এক ব্যক্তি না হয়ে একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হয় সেখানে ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলক বেশী হয়ে দাঁড়ায়, যে কারণে এর পরিণাম যুদ্ধ ও হানাহানি আকারে প্রকাশ পায়।

যারা এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে যে, কাফের ও মুরতাদদের সাথে ইসলামের বিপরীতমুখী ভিন্ন ভিন্ন আচরণের হেতু কি? তারা সম্ভবত জানেনা যে, দুনিয়ার কোন সমাজ ব্যবস্থাই এমন নেই যারা নিজেদের মধ্যে শামিল হয়ে যাওয়া ব্যক্তি আর শামিল হবার পর বের হয়ে যাওয়া ব্যক্তির সাথে একই রকম আচরণ করে থাকে। পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে কোন না কোন ধরনের শাস্তি অবশ্যই দেয়া হয় এবং বার বার তাদেরকে ফিরে আসার জন্য বাধ্যও করা হয়। বিশেষত যে শাসন-বিধান যত বেশী সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়বাহক তাদের আচরণ এ ব্যাপারে ততবেশী কঠিন হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে সেনাবাহিনীর কথা স্মরণ করুন। কম-বেশী জগত জোড়া একই আইন প্রচলিত হয়ে আসছে যে, কাউকে সামরিক পেশা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয় তাকে চাকরীতে থাকার জন্য বাধ্য করা হয়। তার ইস্তফা গৃহীত হয় না। নিজে চাকরী ছেড়ে গেলে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে তাকে 'মৃত্যদন্ড' দেয়া হয়। সামরিক বাহিনীর স্বাভাবিক কাজে অবহেলা প্রদর্শন করলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড পর্যন্ত দেয়া হয়। এমনকি যে ব্যক্তি তাকে আশ্রয় দান করবে অথবা তার অপরাধ গোপনের চেষ্টা করবে তাকেও অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বিপ্লবী দলগুলোও এ নীতি অবলম্বন করে থাকে। তারাও কাউকে তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য বাধ্য করে না। কিন্তু একবার যোগ দেয়ার পর যে ব্যক্তি বের হয়ে যায় তাকে তারা গুলী করে উড়িয়ে দেয়। এ তো হলো ব্যক্তি আর দলের ব্যাপার। কিন্তু যেখানে দলে দলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় সেখানে এরচেয়েও কঠিন আচরণ করা হয়। সংযুক্তি (Federation) ও বন্ধুত্ব স্থাপন (confedering) সম্পর্কে অধিকাংশ সময় আপনারা শুনে থাকবেন, যেসব রাষ্ট্র এ ধরনের ঐক্যে শরীক হয় তাদেরকে শরীক হবার বা না হবার স্বাধীনতা দেয়া হয়। কিন্তু শরীক হয়ে যাবার পর বের হবার পথ শাসনতান্ত্রিকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। বরং যেখানে শাসনতন্ত্রে এ ধরনের কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকে না সেখানেও বিচ্ছিন্ন হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি যুদ্ধের দ্বার পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। উনবিংশ শতকে এ ধরনের দু'টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথম যুদ্ধ সুইজারল্যান্ডে সংঘটিত হয়েছে ১৮৪৭ সনে তখন সাতটি রোমান ক্যাথলিক রাজ্য Confederation থেকে

বেরিয়ে যেতে চাইলে, ফেডারেশনের অন্যান্য শরীক দেশগুলোর সাথে তাদের যুদ্ধ লেগে গেলো। যুদ্ধ করে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে ফেডারেশনে থাকতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় যুদ্ধটি আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (American civil war) নামে খ্যাত। ১৮৬০ সনে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য কাঠামো হতে সাতটি অঙ্গ রাজ্য বেরিয়ে পড়ে তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের শপথ গ্রহণ করলো। অতঃপর আরো চারটি রাজ্য একত্র হয়ে সে সাত দেশীয় সংযুক্তির সাথে এসে যোগ দিলো। ছয়টি রাজ্যের সাধারণ জনমত ছিলো যে, প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্য ইচ্ছা করলে পৃথক হয়ে যাবার অধিকার থাকতে হবে। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার জোর-জবরদস্তি করে সংযুক্ত রাষ্ট্র কাঠামোতে ফিরে আসাতে তাদের বাধ্য করতে পারে না। এ বিতর্ককে কেন্দ্র করে ১৮৬১ সনে সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়। তিন-চার বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পুনরায় তাদেরকে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত থাকতে বাধ্য করা হলো।

ঐক্য সৃষ্টির পর ঐক্য ভঙ্গের বিরুদ্ধে সাধারণত সকল সমন্বিত শক্তি বিশেষ করে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কেন? এর স্বপক্ষে শক্তিশালী দলিল হলো, সফলতার জন্য সামষ্টিক ব্যবস্থাপনা স্বভাবতই ঐক্য ও স্থিরতার দাবীদার। আর সমষ্টির অঙ্গসমূহের ঐক্য ও সংহতির উপরই সে কাংখিত মজবুতীর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। বিচ্ছিন্নতাকামী অঙ্গ, স্থিতিহীন উপাদান ও অনির্ভরযোগ্য বাহুবলে গঠিত সমষ্টি কল্যাণকর সমাজ জীবন সৃষ্টি করতে পারে না। যেহেতু এ সমষ্টির দৃঢ়তা অনিশ্চিত, স্থিতি নির্ভরহীন, তদুপরি অস্তিত্ব স্থিতিবান নয়-বিপন্ন। বিশেষত যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ তামাদ্দুনিক খিদমতের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী সেগুলোর পক্ষে এতবড় মারাত্মক ঝুঁকি মাথায় তোলার কল্পনাই করা যায় না যে, তার গঠন কাঠামো এমন অঙ্গ-উপাদান সমন্বয়ে গঠিত হোক যা যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে, প্রতিক্ষণে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। বিচ্ছিন্ন ও পতনমুখী ইট-পাথরে গড়া ইমারত এমনিতেই বসবাসের অনুপযোগী, নির্ভয়ে লোক বাসের স্থান নয়, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের বস্তাপচা মাল-মসলার মিশ্রণে একটি দেশ ও জাতির শান্তি-নিরাপত্তা ঘাঁটি নির্মাণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে

পারে না। জাতীয় অস্তিত্ব ও স্থিতির বিনিময়ে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া শিশুদের বিনোদন সমিতির পক্ষে হয়তো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে নিবেদিত প্রাণ কোন দল বা সংগঠনের পক্ষে একথা চিন্তার আশা না করাই ভাল। তাই রাষ্ট্র, সেনাবাহিনী এবং সেইসব দল যারা সুন্দর ও সুচারুরূপে কোন গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক সুনির্দিষ্ট আদর্শের বিপজ্জনক খিদমত করার জন্য তৈরী হয়ে থাকে এবং এ ধরনের অন্যান্য সংস্থা এ কথার উপর বাধ্য যে, ফিরে যাবার লোকদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে দেবে এবং আপন সংগঠনের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। মজবুত ও নির্ভরযোগ্য অংশ লাভ করার এরচেয়ে সফল উপায় আর কিছু নেই যে, আগমনকারী লোকদের পূর্ব থেকেই এইমর্মে জানিয়ে দেয়া যে, এখান থেকে ফিরে যাবার পরিণতি মৃত্যু। কেননা এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বল ব্যক্তি নিজেরাই ভেতরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয়ত বর্তমান অংশরাশীকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার হাত থেকে বিরত রাখার শক্তিশালী উপায়ও এটাই যে, বিচ্ছিন্নতাকামী অংশ নির্মূল করে দেয়া। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদের লালন ক্ষেত্রসমূহ নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং এ চিন্তার বাহক ব্যক্তিবর্গ আপনা থেকেই নিস্তেজ হয়ে আসবে। সাংগঠনিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এ নীতি সঠিক হওয়ার অর্থ এও নয় যে, ন্যায়পরায়ণ, মিথ্যাচারী নির্বিশেষে প্রত্যেক দল বা সংস্থায়ই এ নীতি প্রয়োগের যথার্থ অধিকারী যে, জামাত নিজে স্বয়ং সত্যনিষ্ঠ তার পক্ষে কেবল এ পন্থা অবলম্বন করা যথার্থ হতে পারে। একটি বাতিল শক্তি মিথ্যা জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে যে, মূলত এর জন্মই জুলুমের উপর। এখন নিজ অঙ্গ সমূহ ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তার শক্তি প্রয়োগ করা বৃহত্তর যুলুম।

প্রতিশোধমূলক কার্যক্রমের বিপদ

ইতিপূর্বে আমি বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র ও ধর্মের ধর্মত্যাগের শাস্তির যেসব দৃষ্টান্ত পেশ করেছি তা অপর এক বিভ্রান্তিও দূর করে দেয়। যার কারণে ভাসা ভাসা জ্ঞানের লোকদের চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এসব লোকেরা যদি চিন্তা করে, ইসলামের মত যদি অন্যান্য ধর্মও এভাবে নিজের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যাওয়া লোকদেরকে 'মৃত্যুদন্ড' দেবার আইন পাশ করে, তাহলে এ ব্যবস্থা

ইসলামের তাবলীগের পথে তেমনি অন্তরায় সৃষ্টি করবে, যেমন অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে অন্তরায় হয়ে থাকে। এ প্রশ্নের নীতিগত জবাব এর আগে আমরা দিয়েছি। কিন্তু এখানে আমরা এর কার্যকর জবাবও পেয়ে যাই। আপত্তিকারীরা অজ্ঞতার কারণে নিজদের আপত্তি 'যদি' শব্দে পেশ করে। ব্যাপারটি যেন তা নয়। অথচ যে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করে, তা বাস্তব ঘটনা রূপেই বিদ্যমান। যে ধর্ম নিজস্ব রাষ্ট্র সংস্থার অধিকারী সে তার ক্ষমতার সীমারেখায় ধর্মত্যাগের দরজা শক্তি বলে বন্ধ করে আছে। ভুল বুঝা বুঝি শুধু এ কারণে যে, আজকাল ঈসায়ী জাতি তাদের নিজের দেশে ঈসায়ী ধর্মত্যাগীদের কোন রকম সাজা দেয় না। তারা বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশী মত যে ধর্ম পছন্দ করে তা গ্রহণে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। এ কারণে মানুষ মনে করে যে, তাদের আইনে ধর্মত্যাগ করা কোন অপরাধ নয়। তাই তাদের জন্য এটা এক রহমত। এ কারণে ধর্মীয় তাবলীগের স্থান সব প্রতিবন্ধকতার উর্ধে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো–ঈসায়ী ধর্ম সে জাতির লোকদের শুধু ব্যক্তিগত ধর্ম। তাদের সামষ্টিক দীন নয়, যার উপর তাদের সমাজ–জীবন ও তাদের রাষ্ট্রের ইমারত কায়েম হবে। এ কারণেই ঈসায়ী ধর্মত্যাগীদের প্রতি তারা এমন গুরুত্বই আরোপ করে না যে, এর উপর তারা বাধা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। কিন্তু যে সামষ্টিক ও রাষ্ট্র ধর্মের উপর তাদের সমাজ জীবন ও রাষ্ট্র জীবনের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে সে ধর্ম বর্জন করা তাদের নিকটও ইসলামের সমমাত্রায় অপরাধ। একে দমন করার ব্যাপারে সেও এতটাই কঠোর যতটা কঠোর ইসলামী রাষ্ট্র। ইংরেজদের সামাজিক ধর্ম দীনে ঈসায়ী নয়। বরং বৃটিশ জাতির ক্ষমতা, তাদের সংবিধান ও আইনের শাসন–বৃটিশ রাজশক্তি যার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। অনুরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামষ্টিক ও রাষ্ট্র ধর্মও দীনে ঈসায়ী নয়। বরং মার্কিন জাতীয়তাবাদ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ক্ষমতাই তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এরই ভিত্তিতে তাদের সমাজ এক পর্যায়ে রাষ্ট্র কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য ঈসায়ী জাতির সামষ্টিক দীনও একইভাবে ঈসায়ী ধর্মের পরিবর্তে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র ও সংবিধান। এসব দীন থেকে তাদের কোন জন্মগত অথবা অবলম্বিত অনুসারী একবার ধর্ম ত্যাগ করে দেখুক না। তখনই বুঝতে পারবে তাদের ওখানে ধর্মত্যাগ করা অপরাধ কি অপরাধ নয়? ব্যাপারটিকে বৃটিশ আইনের জনৈক

চিন্তাশীল লেখক বিশ্লেষণ করেছে তিনি লিখেছেনঃ

"যে সব কারণে ধর্মের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করলে সাজা দেবার ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিজ হাতে গ্রহণ করে, সেসব কারণের অনুসন্ধান বিস্তারিতভাবে এখানে আমি করতে চাই না। শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেছে–বিশেষ কোন কাজ বা কর্মপদ্ধতি যা ধর্মে নিষিদ্ধ সামষ্টিক জীবনেও তা ক্ষতিকর ও বিশৃংখলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে এসব কাজ বেআইনী ও এর অপরাধকারী শাস্তি পাবার যোগ্য সাব্যস্ত হয়। এজন্য নয় যে, সে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করেছে–বরং তার এ সাজা রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গের অপরাধে দেয়া হয়ে থাকে।"

অগ্রসর হয়ে তিনি আরো লিখেছেনঃ "দীর্ঘদিন যাবত ইংরেজ আইনে ইরতেদাদের অর্থাৎ ঈসায়ী ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যাবার শাস্তি 'মৃত্যুদন্ড' ছিলো। এরপর আইন রচনা করা হল যে, ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত ও এ ধর্ম অনুসরণে ওয়াদাবদ্ধ কোন ব্যক্তি যদি লেখনী, প্রকাশনা, শিক্ষা অথবা সুচিন্তিত বক্তব্য পেশের মাধ্যমে এ ধারণা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ একজনের পরিবর্তে একাধিক অথবা ঈসায়ী ধর্ম হক হওয়া কিংবা পবিত্র কিতাব আল্লাহর তরফ থেকে আসার ব্যাপারে অস্বীকার করে তাহলে প্রথম ভুলের কারণে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বাহিনীতে যোগদান হতে তাকে বঞ্চিত করা হবে। আর দ্বিতীয় ভুলের জন্য তিন বছরের শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু নিশ্চিন্তেই বলা যায় যে, এ আইনের আওতায় আজ পর্যন্ত কারো উপর মোকদ্দমা চালানো হয়নি।"

কয়েক লাইন পর তিনি আবার লিখেনঃ "বলা হয়ে থাকে যে, ঈসায়ী ধর্ম ইংরেজ আইনের একটি অংশ আর এর বিরুদ্ধে কোন অরুচিকর আক্রমণের প্রতিকারে রাষ্ট্রের তরফ থেকে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এ অপরাধের আওতায় গণ্য হবেঃ কোন লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব অথবা তার তকদীর অস্বীকার করা, আমাদের আল্লা ও মুক্তিদাতা মসিহর দুর্নাম রটনা, পবিত্র কিতাব বা–এর অংশ বিশেষের প্রতি ঠাট্টা–বিদ্রুপ করা। এর উপর কেবল এতটুকু সংযোজন বাকী থাকে যে, এ আইন কদাচিতই কখানো ব্যবহার করা হয়েছে কি–না বলা কঠিন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঈসায়ীয়াত (অর্থাৎ যাকে তারা আল্লাহর আইন বলে) যেহেতু এখন আর দেশের আইন নয় তাই রাষ্ট্র প্রথমতঃ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের শাস্তি দেবার দায়িত্বই গ্রহণ করে না। অথবা এ কারণে যে, এখন পর্যন্ত ঈসায়ী ধর্ম শাসক শ্রেণীর ধর্ম হওয়ার সুবাদে তারা নামে মাত্র এ দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকলেও তা বাস্তবে কার্যকর করার পন্থা সর্বদা এড়িয়ে চলে। কিন্তু স্বয়ং দেশের আইন যা প্রকৃতপক্ষে সামষ্টিক দীন, সে ব্যাপারেও কি তাদের কর্মপদ্ধতি এটাই? যদি একটু সাহস করে বৃটিশ নাগরিকদের কেউ বৃটিশ–সাম্রাজ্যে বাস করে দেশের রাজকীয় ও ক্ষমতাসীন সরকারের আইনকে মানতে অস্বীকার করে তাহলে আপনাদের পক্ষে এর বাস্তব জবাব পাওয়া কষ্টকর হওয়ার কথা নয়।

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ওই অবস্থা তো কার্যত; কায়েম আছে যার ব্যাপারে ভুলবশত; বলা হয় যে, 'যদি' এমন হয় তাহলে কি হবে। কিন্তু সে পরিস্থিতি কায়েম হলে বর্তমানকালের ধর্মীয় প্রচারে এ কারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না যে, আজকাল দুনিয়ায় যেসব ধর্মের প্রচার করা হয় এরমধ্যে কোন ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হলে বিশ্বের রাষ্ট্র শক্তিগুলির রাষ্ট্র নামের "সমাজ ধর্মে" কোন অসুবিধা হয় না। যেহেতু সকল ধর্ম কার্যতঃ এ সামষ্টিক দীনের অধীন হয়ে থাকে। আর সেই সীমার ভিতরেই বিচরণ করে যার মধ্যে রাষ্ট্র তাদেরকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। অতএব রাষ্ট্রের আদেশের অধীন ও হুকুমের অনুরাগী হয়ে আপনি যদি এক মাযহাবের আকীদা ও আমল ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন মাযহাবের আকীদা ও আমল অবলম্বন করে নেন তাহলে তাদের তথাকথিত "সামষ্টিক দীনের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে আপনার মধ্যে কোন পার্থক্য প্রকাশ হয় না। আপনি ধর্মত্যাগের মতো অপরাধও করেননি, যার জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তবে হাঁ, আপনি ইতেকাদ ও আমলের দিক দিয়ে এ ইজতেমায়ী দীন ছেড়ে যদি কাফের হয়ে যান এবং অন্য কোন ইজতেমায়ী দীনের ইতকাদী মুমেন হয়ে আমলী মুসলমান হওয়ার চেষ্টা চালান, তাহলে আজকের প্রতিটি শাসক আপনার সাথে সেই আচরণই করার জন্য প্রস্তুত যা আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগের শাসকরা হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসসাল্লামের সাথে করার জন্য তৈরী হয়েছিলো। যথা আল–কুরআনের ভাষায়ঃ

ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (المؤمن-٣)

(ফিরআউন বলল), আমাকে ছাড়, মূসাকে আমি হত্যা করি এবং সে তার পালনকর্তার শরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনে পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (সূরা মু'মিন, ২৬আয়াত)।

জন্মগত মুসলমানের ব্যাপার

এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায় যা 'মুরতাদ' হত্যার হুকুম প্রসঙ্গে অনেকের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে। প্রশ্নটি হলো, যে ব্যক্তি অমুসলিম ছিলো অতঃপর স্বেচ্ছায় সে ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় কাফির হয়ে গেলো-এ ব্যক্তির ব্যাপারে তো আপনি বলতে পারেন যে, সে বু[illegible] ভুল করেছে। কেন সে জিম্মী হিসেবে থাকলো না। আর কেন সে এমন ই[illegible]মায়ী দীনে প্রবেশ করলো যেখান থেকে বের হবার দরজা বন্ধ-কথাটা তার জানা ছিলো। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং মুসলমান মাতা-পিতার ঘরে জন্ম নেয়ার কারণে ইসলাম আপনা আপনিই তার দীন হয়ে গেছে এ ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর যদি ইসলামে তৃপ্ত না হয় এবং এর থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তাহলে ধর্মত্যাগের শাস্তি 'মৃত্যুদন্ডের' ধমক দিয়ে আপনারা তাকে ইসলামে থাকতে বাধ্য করছেন, এটাও মস্তবড় যুলুম। এটা শুধু বাড়াবাড়িই নয় বরং এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে জন্মগত মোনাফীকের একটা বিরাট অংশ ইসলামের ইজতেমায়ী জীবন ব্যবস্থার অন্তরালে লালিত হতে থাকবে।

এ সন্দেহের দুটো জবাব। একটি নীতিগত, অপরটি কার্যগত। নীতিগত জবাব হলো, জন্মগত ও অবলম্বিত অনুগতদের মধ্যে আহকামের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য সূচিত করা যায় না। আর না কোন দ্বীন কখনো-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেছে। প্রত্যেক দ্বীন তার অনুসারীদের বংশধরদেরকে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের অনসারী হিসেবে গণ্য করে। আর তাদের উপর সেই সমস্ত বিধান জারি

করে যা অবলম্বিত অনুসারীদের উপরে জারি করে থাকে। দ্বীনের অনুসারীদের অথবা রাজনৈতিক পরিভাষায় প্রজা ও নাগরিকদের বংশধরদের প্রথমত কাফির অথবা বিদেশী (Aliens) হিসেবে লালন আর যে দ্বীনে তার জন্ম হয়েছে, বালেগ হবার পর সে তার অনুগত ও রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে কি থাকবে না–এ ফায়সালার ভার তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে–কার্যত একথা অসম্ভব এবং যুক্তির দিক দিয়েও তা অর্থহীন। এভাবে দুনিয়ার কোন সামষ্টিক বিধান চলতে পারে না। সামষ্টিক জীবন ব্যবস্থা জারি ও একে দৃঢ় রাখাটা সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে সেই এলাকার স্থিতিবান আবাদীর উপর যারা এর আনুগত্যের সুদৃঢ় ও কায়েম থাকার জন্য এর জীবন পরিক্রমার দায়িত্ব বহন করে। বস্তুত এ ধরনের স্থিতিশীল আবাদী কেবল তখনই গড়ে উঠে যখন বংশ পরম্পরায় এ জীবন ব্যবস্থাকে জারি রাখার জিম্মাদারী গ্রহণ করে চলতে থাকে। কোন জীবন বিধানের অনুসারী ও নগরবাসীদের বংশানুক্রমে এ অনুসরণ ও নাগরিকত্বের উপর কায়েম থাকা ও সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটা সন্দেহযুক্ত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তাহলে সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদ সব সময়ের জন্য দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়বে এবং তাতে স্থিতি আসতে পারে না। সুতরাং জন্ম সূত্রে নাগরিকত্ব ও আনুগত্যকে ব্যক্তি ইচ্ছাধীন করে এবং প্রত্যেক পরবর্তী বংশের জন্য দ্বীন, দস্তুর ও আইনসহ সকল আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে চলার খুলে দেয়ার প্রস্তাব অযৌক্তিক কল্পনা মাত্র। বিশ্বের কোন দ্বীন, কোন সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা, কোন রাষ্ট্র আজ পর্যন্ত এ নীতি অবলম্বন করেনি।

এ প্রশ্নের কার্যকর জবাব হলো, আমাদের আপত্তি উত্থাপনকারীগণ যে আশংকা প্রকাশ করে তা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ক্ষেত্রে কোথাও প্রকাশ হয় না। প্রত্যেক সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার যাতে কিছু হলেও জীবন চালিকা শক্তি ও আগ্রহ বিদ্যমান আছে; পূর্ণ মনোযোগসহ নিজেদের সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণকারী বংশধরদের প্রতি নিজেদের ঐতিহ্য, তাহযীব, নীতিমালা ও আনুগত্যের প্রবাহ স্থানান্তরিত করে অধিকতর আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা কর্তব্য। এ শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের ফলে নতুন বংশধরদের হাজারে ৯৯৯–এরও অধিক আপন জীবন ব্যবস্থার তাবেদারী ও এর বিশ্বস্ত আনুগত্যশীল হিসেবে গড়ে উঠে, যে ব্যবস্থায়

তারা জন্মগ্রহণ করে। এ অবস্থায় নগণ্য সংখ্যক এমন লোক জন্মগ্রহণ করে যারা বিভিন্ন কারণে এড়িয়ে চলা ও বিদ্রোহের প্রবণতা নিয়ে গড়ে ওঠে অথবা পরে সে দীক্ষা গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের কিছু লোকের কারণে মূল নীতিমালায় এমন কোন পরিবর্তন আনা যায় না যার দ্বারা গোটা সমাজের জীবন বিপন্ন ও অনিশ্চিয়তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এ ধরনের গুটিকয়েক লোক যদি ইজতেমায়ী দীন থেকে বিমুখ হয়ে পড়তে চায় তাহলে তাদের জন্য দুটি দরজা খোলা আছে। তারা হয় রাষ্ট্রীয় সীমার বাইরে গিয়ে এ দ্বীন থেকে দূরে থাকবে অথবা যদি তারা এ বিমুখিতায় স্থিরচিত্ত হয় এবং যে অপর ব্যবস্থাকে তারা ভালবাসে ও পছন্দ করে তার আনুগত্য ও অনুসরণে স্থির বিশ্বাসী এবং নিজের বাপ–দাদার দ্বীনের পরিবর্তে নতুন মতবাদ কায়েম করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে যুদ্ধে নেমে পড়ুক, যে যুদ্ধ ছাড়া কোন জীবন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা যায় না।

অতএব মূল বিষয় এই ধরে নিতে হবে যে, মুসলমানদের ঘরে জন্মগ্রহণকারী সন্তানকে মুসলমানই ধরা হবে। আর ইসলামী আইনানুসারে ধর্মত্যাগের অনুমতি তাদের কোন অবস্থাতেই দেয়া হবে না। এদের কেউ যদি ইসলাম বর্জন করে, তাহলে সেও এভাবে হত্যার যোগ্য বিবেচিত হবে যে রকম একজন কাফির ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে গেলে হত্যাযোগ্য সাব্যস্ত হয়। এটা ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের সর্বসম্মত ফায়সালা। শরীয়ত পারদর্শীদের মধ্যে এ ব্যাপারে আদৌ মতভেদ নেই। অবশ্য বিষয়টার একটা দিক আমার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়। তাহলো দীর্ঘকাল যাবত আমাদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে আছে। আমাদের সমাজের কয়েক পুরুষ এমন অতিবাহিত হয়েছে যারা পরবর্তী বংশধরদেরকে ইসলামী তালীম ও তরবিয়ত দিতে মারাত্মক ত্রুটি করেছে। বিশেষ করে বিগত গোলামীর যুগে আমাদের জাতি অবচেতনার এমন চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো যে, আমাদের লাখ লাখ লোক বেপরোয়া হয়ে আর হাজার হাজার লোক জেনে বুঝে তাদের সন্তান–সন্তুতিকে কুফরী শিক্ষা ব্যবস্থার হাতে সপর্দ করে দিয়েছে। এ কারণেই আমাদের সমাজে ইসলামের সাথে বিদ্রোহ–বিরোধের প্রবণতা সম্পন্ন লোকদের সংখ্যা

মারাত্মক রকম বেড়ে যাচ্ছে। দিন দিন তা বেড়েই চলছে। যদি ভবিষ্যতে কোন সময় ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয় [১] এবং ধর্মত্যাগীর শাস্তি 'মৃত্যুদন্ড' কার্যকর করা হয় আর সে সকল লোকদেরকে জোর করে ইসলামের সীমায় এনে আটক করা হয়, মুসলমানের সন্তান হবার কারণে যারা জন্মসূত্রে ইসলামের অনুসারী ও অনুগামী হিসেবে পরিচিত, তাহলে তাদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক এ অবস্থায় নিঃসন্দেহে ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় মুনাফিকির আচরণ অবলম্বন করবে এবং তাদের দ্বারা সব সময় বিশ্বাসঘাতকতার মারাত্মক আশংকা দেখা দেবে।

আমার নিকট এ সমস্যার সমাধান হলো, والله الموفق للصواب (আল্লাহ সঠিক পন্থা অনুসরণের তৌফিক দিন) যে এলাকায় ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হবে সেখানকার মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় এই মর্মে নোটিশ দিয়ে দিতে হবেঃ যারা আকীদাগতভাবে ও কর্মের দিক দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে আর তারা দূরেই অবস্থান করতে চায়, তারা যেন নোটিশ জারি হবার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে নিজে অমুসলিম হওয়ার কথা ঘোষণা দিয়ে আমাদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে যায়। এ নোটিশের সময়সীমা পার হয়ে যাবার পর মুসলিম বংশে জন্মগ্রহণ করা জনসমষ্টিকে মুসলিম গণ্য করা হবে। অতঃপর ইসলামের সকল আইন-কানুন এদের উপর জারি করা হবে। ধর্মের ফরজ ও ওয়াজিব পালন করার ব্যাপারে তাদেরকে বাধ্য করা হবে। এরপর যারা ইসলাম বর্জন করে বের হয়ে যাবে তাদের হত্যা করা হবে। এ ঘোষণার পর যত সংখ্যক মুসলমান যুবক-যুবতীকে কুফরীর হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। এরপর কোন অবস্থাতেই যাদের বাঁচানো যাবে না পাষাণ পরাণে তাদেরকে সমাজ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এ সংস্কারপর্ব সমাপনের পর এমন মুসলমানদের সমন্বয়ে ইসলামী সমাজে নবজীবনের সূচনা করতে হবে যারা ইসলামের উপর সম্পূর্ণ রাজি।

কুফরীর প্রচার ক্ষেত্রে ইসলামী আচরনের যৌক্তিকতা

প্রশ্নকারীর শেষ প্রশ্ন হলোঃ যদি ইসলামী হুকুমাতের সীমায় কুফরী মতবাদ প্রচারের অনুমতি না থাকে তাহলে যুক্তির আলোকে এ নিষিদ্ধতা কিভাবে সঠিক ও বৈধ হিসেবে প্রমাণ করা যায়?

এ ব্যাপারে আলোচনা করার পূর্বে ইসলামে যে কুফরী মতবাদ প্রচার নিষিদ্ধ তার ধরন সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। কোন অমুসলিম তার নিজের সন্তান–সন্তুতিকে নিজের ধর্ম সম্পর্কে তালীম–তরবিয়ত দেয়া অথবা বক্তৃতা বা লিখনীর মাধ্যমে নিজের আকীদা–বিশ্বাস ও এর নীতিমালা জনসমক্ষে প্রচার করা কিংবা ইসলামের ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকলে তা শিষ্টাচারের সাথে অথবা লিখনীতে প্রকাশ করা ইত্যাদি ইসলাম নিষিদ্ধ করে না। এমন কি কোন অমুসলিমের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মী নাগরিকদের কেউ তার মতবাদ গ্রহণ করলে তাতেও ইসলামের কোন আপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটি ইসলামে নিষিদ্ধ তাহলো, কোন মতবাদ অথবা কোন জীবন ব্যবস্থার চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের স্বপক্ষে এমন কোন সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা যা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের সেই মতবাদ বা জীবন ব্যবস্থার প্রতি আহ্বান জানায়। এ ধরনের সুসংগঠিত আহ্বান চাই জিম্মীদের তরফ থেকে হোক, চাই বহিরাগত অমুসলিমদের তরফ থেকে হোক কোন অবস্থায়ই ইসলাম তার নিজস্ব সীমায় এ জাতীয় প্রচারকার্য সহ্য করতে আদৌ প্রস্তুত নয়।

এর সোজা ও সুস্পষ্ট কারণ হলো একটি সুসংগঠিত দাওয়াত অবশ্যই হয় রাজনৈতিক হবে অথবা ধর্মীয় ও নৈতিক ধরনের হবে। যদি তা রাজনৈতিক ধরনের হয় এবং এর লক্ষ্য হয় প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন করার, তাহলে

---

১ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটি ১৯৪২ সনে লিখা হয়েছে।

দুনিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রও এর প্রবল বিরোধিতা করে। আর সেটা যদি দ্বিতীয় ধরনের দাওয়াত হয়, তাহলে নির্ভেজাল পার্থিব রাষ্ট্রের বিপরীত। ইসলাম তাকে এ জন্য স্বীকার করতে পারে না যে, কোন ইতেকাদী ও চারিত্রিক পথভ্রষ্টতাকে নিজের হিফাজাত ও তত্ত্বাবধানে মাথা উঠাবার সুযোগ দেয়া পরিপূর্ণভাবেই সেই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী যার জন্য ইসলাম রাষ্ট্রীয় শাসনদন্ড নিজ করায়ত্তে রাখে। এ ব্যাপারে নির্ভেজাল পার্থিব রাষ্ট্রের কর্ম–পদ্ধতি ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ম–পদ্ধতি হতে অবশ্যই ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা উভয় হুকুমাতের উদ্দেশ্য ভিন্ন। দুনিয়াবী রাষ্ট্র প্রত্যেক মিথ্যা, প্রত্যেক ধরনের বিশ্বাসগত ফাসাদ এবং হরেক রকমের দুষ্কৃতি, বদ আখলাক এবং একইভাবে প্রত্যেক ধরনের ধর্মীয় গোমরাহীকেও নিজের এলাকায় প্রচার প্রসারের অনুমতি দেয়। উপরন্তু আইনের রসি শিথিল করে ছেড়ে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচারকরা তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করতে থাকে। আর তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আঘাত পড়ার মত কোন কাজ না করে। অবশ্য যে আন্দোলনের প্রভাবে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আঘাত পড়ার মত সামান্যতম আশংকা দেখা দেয় সাথে সাথেই তা বেআইনী ঘোষণা দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে সেসব দমন করে দিতে তারা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না। তাদের এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের কারণ হলো, আল্লাহর বান্দাদের আখলাকী ও রূহানী কামিয়াবীর ব্যাপারে তাদের কোন আকর্ষণ ও মাথা ব্যথা নেই। যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতা হাসিল ও পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারই তাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বান্দাদের আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি বিধান করা। এ কারণেই ইসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতা নিজের হাতে উঠিয়ে নিতে চায়। এই একই কারণে ইসলাম রাজনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি কিংবা বিপ্লব দাঁড় করাবার আন্দোলনের ন্যায় আখলাকী ফাসাদ ও ইতেকাদী বিভ্রান্তি ছড়ানোর মত কোন আন্দোলনকে সহ্য করে না।

এখানে সে প্রশ্ন আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় যে প্রশ্ন মুরতাদ হত্যার ব্যাপারে এসেছিল। অর্থাৎ যদি অমুসলিম রাষ্ট্রও এভাবে তাদের ভূখন্ডে ইসলামের দাওয়াত বেআইনী ঘোষণা করে দেয় তাহলে কি হবে? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হলো; ইসলাম মিথ্যাচার ও বাতিল প্রচারের স্বাধীনতা দানের শর্তে হক

ও সত্য প্রচারের স্বাধীনতা খারদ করতে চায় না। সে তার অনুসারীদেরকে বলে, যদি তোমরা খাঁটি মনে আমাকে সঠিক বলে বিশ্বাস কর আর আমার আনগত্যেই নিজের ও মানবতার মুক্তি নিহত বলে দেখো, তাহলে আমারই অনুসরণ করো। আমাকে কায়েম করো। দুনিয়াকে আমার প্রতি দাওয়াত দাও। এ কাজে চাই তোমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ফুল বাগান দিয়ে পথ অতিক্রমের সম্মুখীন হও অথবা নমরুদের অগ্নিকুন্ডে পথ চলার পরিস্থিতি আসুক। এটা তোমাদের ঈমানের দাবী। তোমাদের খোদাভীতির উপর এ কাজ নির্ভরশীল যে, তার সন্তুষ্টি কামনা করলে সে দাবী পুরণ করো অথবা না করো। কিন্তু তোমাদেরকে এ পথের বিপদ–আপদ থেকে বাঁচানো আর এ কাজকে তোমাদের জন্য সহজ করে তোলার বিনিময়ে বাতিল পন্থীরা আল্লাহর বান্দাদের বিভ্রান্ত ও গুমরাহ করার এবং এমন পথে পরিচালিত করার অবাধ স্বাধীনতা দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব যে পথে তাদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই বলে আমি নিশ্চিত। এটা ইসলামের চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত, অটল ফয়সালা। এ বিষয়ে ইসলাম কারো সাথে আপোস করতে রাজি নয়। যদি অমুসলিম রাষ্ট্র আজ কিংবা আগামীতে কোন সময় ইসলামের তাবলীগকে অপরাধ বলে সাব্যস্ত করে যেভাবে তারা আগেও এ কাজকে অপরাধ বলেই সাব্যস্ত করে এসেছে, তা সত্ত্বেও এ সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। বরং সত্য কথা এই যে, ইসলামের জন্য সে সময়টা ছিলো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তখন কাফিরের দৃষ্টিতে ইসলাম এতই অক্ষতিকর ছিল যে, এর দাওয়াত ও তাবলীগকে সে সন্তুষ্ট চিত্তে সহ্য করতে লাগলো এবং কুফরী আইনের তত্ত্বাবধানে ও নিরাপদ আশ্রয়ে ইসলামের প্রচার–প্রসারের যাবতীয় সুযোগ–সুবিধা করে দেয়া হলো। ইসলামের সাথে কুফরের এ জাতীয় রেয়াত সুবিধা ও আপোসকামিতা প্রকৃতপক্ষে কোন সুসংবাদ বহন করে না। এটা বরং তারই নিদর্শন যে, ইসলামের রূপ কাঠামোতে তার জীবন্ত প্রাণ বিদ্যমান নেই। অন্যথায় আজকের কাফিরগোষ্ঠী ও ইসলাম বিদ্বেষীরা তাদের পূর্বসুরী নমরুদ, ফেরাউন, আবু জেহেল, আবুলাহাবের অপেক্ষা অধিক সত্যপরায়ন ও ভদ্র হয়ে যায়নি যে, মুসলিম নামের এই দেহাবয়বে ইসলামের আসল প্রাণ জীবন্ত থাকা সত্ত্বেও তারা এর পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা দিয়ে যাবে অথবা কমপক্ষে এর প্রচার ও প্রসারের স্বাধীনতা দান

করবে। যেদিন থেকে তাদের বদান্যতায় ইসলামের দাওয়াত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ফুলবাগানের সুশোভিত ফুলচন্দন হয়ে আছে, সেদিন থেকে ইসলামের ভাগ্যে এ অপমান ও লাঞ্চনা শুরু হয়েছে যে, একে সে সমস্ত ধর্মের কাতারে শামিল করে দেয়া হয়েছে যেসব ধর্ম প্রত্যেক যালিম রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তামাদ্দুনের অধীনে আরাম ও বিলাস ভোগের স্থান পেতে পারে।

অতীব সৌভাগ্য ও বরকতময় হবে সেই মুহূর্তটি যখন এসব সুবিধা-সুযোগ ও ভোগ-বিলাস প্রত্যাহার করে নেয়া হবে এবং দীনে হকের প্রতি আহ্বানকারীদের পথে পুনরায় নমরুদের প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ড বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সে সময়েই কেবল ইসলাম সেই সকল নিষ্ঠাবান অনুসারী ও নিবেদিত প্রাণ আহ্বানকারীর সন্ধান পেতে পারে যারা তাগুতের মস্তক চূর্ণ করে এর উপর সত্য ও হককে বিজয়ী করার সুদক্ষ সৈনিক প্রমাণীত হবে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—